শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উপহার

সাংগ্রিলার মঠে

সূচনা

বহুদিন পরে জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হইল স্যাভয় হোটেলে।

জয়ন্তর সঙ্গে ছ'বছর কলেজে পড়িয়াছি। পড়াশুনায় সে বরাবরই ভাল। তা'ছাড়া দেশভ্রমণের তার দারুণ নেশা। যখন পাশ করিতে আর একটাও বাকী রহিল না, তখন ভাবিয়াছিলাম, জয়ন্ত এবার কোন বিলাতী ডিগ্রী লইয়া মোটা মাহিনায় সরকারী চাকুরীতে জাঁকাইয়া বসিবে।

সূচনা

জয়ন্ত কিন্তু সেদিক দিয়াই গেল না, কহিল, 'পড়া শেষ হয়েছে ; এখন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো। তার মত শিক্ষা আর আছে নাকি !'

জয়ন্তর বাপের অগাধ পয়সা। সে বাপও ওর কলেজ ছাড়িবার কিছুদিনের মধ্যে মারা যান। ওকে তখন আর আটকায় কে ? এই কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়ার প্রায় সব জায়গায়ই ঘুরিয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে লম্বা পাড়ি দিয়া, হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইত। কয়েক দিন হৈ-চৈ করিয়া কাটাইয়া আবার কোথায় যে ডুব মারিত, অনেক দিনের মধ্যে তার আর পাত্তা পাওয়া যাইত না। বছর দুই আগে তাস্‌খন্দ না ইয়ারখন্দ্ কোথা হইতে আমাকে এক লম্বা পত্র দিয়াছিল। তারপরে সব চুপচাপ। এবার নাকি জাপান, চীন, শ্যামদেশ প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়াছে।

জয়ন্ত কহিল, 'তোর কাছেই যাচ্ছিলুম। ভাগ্যিস্ দেখা হয়ে গেল, নইলে ঘুরে আসতে হ'ত···' বলিয়া সে আমাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল। ঘরে আসিয়া সে একটা সিগারেট ধরাইল। বেয়ারাটাকে ডাকিয়া খাবার আনিবার হুকুম দিয়া কহিল, 'এবারে অনেকদূর ঘুরে এলাম রে নিখিল !'

প্রশ্ন করিলাম, 'কবে ফির্‌লি ? আর কোত্থেকেই বা হঠাৎ উদয় হলি !'

জয়ন্ত একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, 'ওল্ড বয়! ঘর ছেড়ে কখনও বেরুলি না। টোকিও থেকে রেঙ্গুন অবধি লম্বা পাড়ি দিয়েছি। রেঙ্গুন থেকে আজই সবে কলকাতায় পা দিয়েছি। আবার আজই দিল্লী রওনা হব। দিল্লী গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেব।'

কহিলাম, 'আজই রওনা হবি একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছিস্ নাকি?'

'ঠিক করা কি বলিস্? মালটাল সব ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার গাড়ীর আর ঘণ্টা দুই সময় আছে। বেরুচ্ছিলুম তোরই খোঁজে। তা' তুই যখন আপনি এসে দেখা দিয়েছিস্, তখন অনেকটা পরিশ্রম বেঁচে গেল। ভাল কথা —চীনে এক ভদ্রলোকের বাড়ী অমৃতবাজার কাগজ যায়। দেখলুম তুই ডি. এস্-সি হয়েছিস্...' বলিয়া আমার পিঠে একটা চাপড় মারিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে খাবার আসিয়া পড়িল। নানারকম গল্প চলিতে লাগিল। জয়ন্তর একটা মস্তবড় গুণ সে ভাল গল্প বলিতে পারে। কথায় কথায় একবার কহিল, 'হ্যাঁরে নিখিল, তোর বিক্রমজিতের কথা মনে পড়ে?'

'মনে পড়ে মানে? একসঙ্গে দু'টি বছর এক হষ্টেলে, একঘরে কাটিয়ে দিলুম, তাকে আর মনে নেই? কি যে বলিস্ তুই!'

সূচনা

'কিন্তু তার খবর কিছু জানিস্?'

বিশেষ কিছু জানিতাম না। কহিলাম, 'না, অনেক দিনের ভিতরে কোন খবর পাইনি। বছর দুই আগে যখন গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার রিপ্রেজেনটেটিভ্ হয়ে বস্কুলে যায়, তখন আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছিল। তারপব বছরখানেক পরে হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলুম, বস্কুলে বিদ্রোহ হয়েছে। সেখানকার ইংরেজ ও ভারতীয় অধিবাসীদের সরিয়ে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখান থেকে এসে বিক্রমজিৎ যে কোথায় গেছে, সে খবর আর জানিনে।'

জয়ন্ত একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সেখান থেকে সে ফিরে এসেছে কিনা তুই জানিস্?'

'ফিরে আসবে না তো যাবে কোথায়? এ্যায়ার ফোর্সের সাহায্যে সকলকে সরিয়ে আনা হয়েচে। তাকে কেন ফেলে আসবে?—তুই কোন খবর জানিস্ নাকি?'

'কিন্তু সত্যিই সে ফিরে আসেনি।' জয়ন্ত আস্তে আস্তে বলিল। জয়ন্তর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম।

বিক্রজিৎ ছিল আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ক্লাশে যেমন সে বরাবর ফার্ষ্ট হয়েছে, খেলাধূলায়ও তেমনি কেহ তাহাকে পিছনে ফেলিতে পারে নাই। তাহার কথা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে সে গেলো কোথায়? তুই শুনেছিস্ কিছু?'

সূচনা

জয়ন্ত সিগারেটের টুকরাটা ফেলিয়া দিয়া আর একটা ধরাইল। কহিল, 'এখন সে যে কোথায় আছে, তা আমিও জানিনে। তবে কয়েকমাস আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে বড় অদ্ভুত কাহিনী ...' বলিয়া সে কুণ্ডলীকৃত সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর সে বলিতে আরম্ভ করিল, 'আমি তখন চুংকিং থেকে হ্যাংকো যাচ্ছি ট্রেনে ক'রে। পথে একজন আমেরিকান মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। দেখলুম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল যথেষ্ট। গান্ধীজির কথা জিজ্ঞেস কর্‌লেন। কথায় কথায় বললেন, তিনি একটা মিশনারী হাসপাতালের চার্জে আছেন, লূ-চাউতে। সেখানকার এক অদ্ভুত রোগীর গল্প করলেন। সে নাকি পাঁচ-ছয়টা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ, তবে কোন্ দেশের লোক তা বলা শক্ত। হয়ত ইটালিয়ান বা ইণ্ডিয়ান হতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করলুম,—কেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতেন? মহিলাটি হেসে বললেন,—সেইখানেই তো মস্ত গোলমাল; তার পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে। কতগুলি চীনা কুলি তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। তা'রা বললে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এখন অবশ্য ভদ্রলোকটি অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। তিনি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারেন।

সূচনা

'এই রকম নানা কথাবার্ত্তায় ট্রেন লূ-চাউ ষ্টেশনে এসে গেল। ভদ্রমহিলা নামবার আগে আমাকে তাঁর কার্ড দিলেন, আর তাঁর হাসপাতালে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর ওখানে যে কোনদিন যেতে পারব এমন সম্ভাবনা ছিল না; তবু বললুম,—সময় পেলেই যাবো।

'কিন্তু এমনই অদৃষ্টের ফের দেখো। মাস দুয়েকের মধ্যেই একটা জরুরি কাজে আমাকে আবার চুংকিং ফিরে যেতে হয়। পথের মধ্যে সেই লূ-চাউ ষ্টেশনে এসেই গাড়ী গেল অচল হয়ে। চীনদেশের খবর তো জানিস্ না! সেখানে গাড়ী খারাপ হলে অন্ততঃ দশবারো ঘণ্টার আগে তা আর চালু হবার সম্ভাবনা থাকে না। কি করি ভাবচি, এমন সময় মনে পড়ল সেই আমেরিকান মহিলাটির কথা। ভাবলুম, যাক্ এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

'মহিলাটি দেখলুম আমাকে চিনতে পারলেন। চা-টা খাওয়ার পর বললেন,—চলুন আমাদের সেই অদ্ভুত রোগীটিকে দেখাই। আমার এমন কিছু কৌতূহল ছিল না। কিন্তু রোগীর বিছানার কাছে গিয়েই অবাক হয়ে গেলুম!—এ যে বিক্রমজিৎ! ও তখন ঘুমুচ্ছিল। অনেকক্ষণ ডাকলুম। তারপর উঠল, কিন্তু আমাকে একেবারেই চিনতে পারল না। ভদ্রমহিলাটিও অবাক হয়ে গেলেন। তাকে বললুম যে, এই রোগী আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং এ ভারতবাসী।

'তারপর চুংকিং যাবার আশা ছেড়ে দিয়ে ওখানেই কয়েকদিন রয়ে গেলুম। কত রকমে যে ওর লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিচ্ছু ফল হ'ল না। পাণ্ডিত্য একটুও কমেনি, শুধু আগের কথাই কিছু মনে করতে পারে না। এ যে কি রকম একটা অবস্থা তা' তোকে ঠিক বুঝাতে পারবো না। আমার সঙ্গে আবার নতুন ক'রে বন্ধুত্ব হ'ল।

'ঠিক করলুম একটু সুস্থ হ'লে ওকে নিয়ে একেবারে ভারতবর্ষে চলে আসব। পাশপোর্ট যোগাড় করা নিয়ে একটু গোলমাল হয়েছিল। টাকার জোরে অবিশ্যি সে সবই কেটে গেল...' বলিয়া জয়ন্ত একটু হাসিল।

সিগারেটটায় জোরে জোরে গোটা দুই টান দিয়া আবার কহিল, 'তারপর এক জাপানী লাইনারে চড়ে বসলুম। জাহাজে আমাদের সঙ্গে একজন ইটালিয়ান ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা তিনি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারেন। জাহাজের কনসার্ট শেষ হবার পরে তিনি কোন কোন দিন যাত্রীদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন।

'একদিন বিক্রমজিতের কি খেয়াল হ'ল, সে পিয়ানোতে গিয়ে দু'চারটে গৎ বাজালে। আমরা বাজনার বিশেষত্ব কিছু বুঝলুম না, ভাল লাগল এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সেই ইটালিয়ানটি এসে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করলেন; তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বিক্রমজিৎ যে গৎগুলো বাজালো, সেগুলি কার রচনা।

সূচনা

'এই প্রশ্ন শুনে বিক্রমজিৎ অনেকক্ষণ কেমন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে একবার সেই ইটালিয়ান ভদ্রলোকের দিকে, একবার আমার দিকে তাকাতে লাগল। তারপর অনেকটা অন্যমনস্কের মত বললে, এ গৎগুলো চোপিনের।

'জবাব শুনে ইটালিয়ানটি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন,—কিন্তু চোপিনের যতগুলি গৎ প্রকাশিত হয়েছে, তার সবগুলিই তো আমি জানি; কিন্তু এগুলি তো কখনও কোন বই-এ দেখিনি।

'বিক্রমজিৎ এবার অনেকটা সহজ সুরে বললে,—'না, এগুলি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি তাঁর এক শিষ্যের কাছ থেকে শিখেছি।

'এই কথায় ইটালিয়ানটি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন,—আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে মশাই! চোপিন মারা গেছেন আজ প্রায় নব্বই বছর হ'ল। তার শিষ্যের শিষ্যও কেউ আজ বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ··· বলে হাসতে হাসতেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে, বিক্রমজিতের মাথা একেবারেই খারাপ।

'কিন্তু আশ্চর্য্য, বিক্রমজিৎ বারবার ক'রে আমার কাছে বলতে লাগল যে, সে এগুলো চোপিনের এক শিষ্যের কাছ থেকেই শিখেছে।

'সেই থেকে সমস্ত দিনটাই সে গম্ভীর হয়ে রইলো। অনেকক্ষণ ডেকের উপর একা একা ঘুরে বেড়ালো। দেখে মনে হ'ল, কি যেন একটা মনে করবার জন্য খুব চেষ্টা করছে। সন্ধ্যার দিকে খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পরে আমার ক্যাবিনে এলো। এসে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। বুঝতে পারছিলুম, কি যেন একটা বলতে চায় আমাকে। শেষটায় বস্কুলের বিদ্রোহের পরের থেকে ওর সমস্ত ইতিহাস ধীরে ধীরে আমার কাছে বললে।

'পরদিন খুব ভোরে জাহাজ ফিজি দ্বীপের কাছে এসে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে বিক্রমজিতের খোঁজ করতে গেলুম। কিন্তু আশ্চর্য্য! ওকে আর দেখতে পেলুম না। টেবিলের উপর একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে—

ভাই জয়ন্ত,

আমি সেইখানেই ফিরে চললুম। বৃথা খোঁজ কোরো না। ইতি—

তোমার বিক্রমজিৎ

'চিঠিটা পেয়ে মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। তখনি বুঝলুম, জাহাজ ঘাটে লাগবার পরে স্থানীয় লোকেরা ডিঙ্গি নিয়ে নানারকম জিনিষ-পত্র বিক্রি করবার জন্য জাহাজের গায়ে এসে লাগে। তারি একটা নৌকায় পালিয়েছে…' বলিয়া জয়ন্ত হাতঘড়ি দেখিল।

ঘড়ি দেখিয়াই সে উঠিয়া পড়িল ; বলিল, 'মাই গুড্‌নেস্‌! সময় হয়ে গেছে রে নিখিল! যাক্‌, ও যে কাহিনী আমাকে বলেছে, আমি তারপর সব গুছিয়ে বইএর আকারে লিখে রেখেছি। এর একটি কথাও আমার বানানো নয়। যেমন ওর কাছে শুনেছি, তেমনটি লিখেছি। দাঁড়া, তোকে খাতাখানা দিচ্ছি...' বলিয়া সে তাহার সুটকেশ হইতে মোটা একখানি বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া দিল।

দুইজনে ট্যাক্‌সি ডাকিয়া হাওড়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। সময় আর বেশী ছিল না। গাড়ীতে উঠিয়া জয়ন্ত কহিল, 'পড়ে দেখিস্‌ খাতাখানা। দিল্লী গিয়ে আমি তোকে আমার ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেবো। তখন তুই তোর মতামত জানিয়ে পত্র লিখিস্‌।'

একটু পরেই হুইসিল্‌ দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জয়ন্ত জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, 'চিয়ারিও, ওল্ড বয়!'

যাযাবর জয়ন্ত কলিকাতা ছাড়িয়া গেল।

বস্কুল আফ্রিদিদের দেশ। সেখানকার আইন-কানুন সবই সভ্য জগৎ হইতে আলাদা। আমরা যেখানে মামলা-মোকদ্দমা করি, তাহারা সেখানে বুকের রক্ত দিয়া ঝগড়ার নিষ্পত্তি করিয়া বসে। তাহারা নিজের প্রাণের যেমন পরোয়া করে না, পরের প্রাণ লইতেও তেমনি একটুকুও সঙ্কুচিত হয় না। এমনই যে দেশের রীতি, সেইখানে বিক্রমজিৎ ভারত-সরকারের প্রতিনিধি এবং সুব্রত তাহার সহকারী।

সাংগ্রিলার মঠে

উনিশ' ত্রিশ সালের শেষাশেষি। স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্রোহ করিয়াছে। বিদ্রোহ থামা তো দূরের কথা, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিল। আফ্রিদিরা চরম কথা জানাইয়া দিয়াছে যে, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বস্কুল হইতে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় অধিবাসীদের চলিয়া যাইতে হইবে। এই আদেশ অমান্য করিলে সবাইকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইবে। এই ভীতি-প্রদর্শন যে শুধুমাত্র মুখের কথা নহে, তাহা কাহারও অজানা নাই। তাই বন্দোবস্ত হইয়াছে, ভারতীয় বিমানবহরের সাহায্যে সেখানকার সমস্ত শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয়দের পেশোয়ারে লইয়া আসা হইবে।

এই অপসারণ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছে বিক্রমজিতের উপর, এবং এজন্য ইন্দোরের মহারাজ তাঁহার প্লেনখানি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন।

বিক্রমজিতের সুব্যবস্থায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকলকেই নিরাপদে রওনা করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বাকী রহিয়াছে শুধু বিক্রমজিৎ এবং সুব্রত।

বিক্রমজিৎ খুব সুপুরুষ;—গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ গড়ন, দীর্ঘ দেহ। ইউনিভার্সিটিতে বরাবর প্রথম হইয়াছে। খেলাধূলায়ও তার জুড়ি ছিল না। কিছুদিন সে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিল।

তারপর সরকারী চাকুরীর কল্যাণে সে নানারকম অখ্যাত কুখ্যাত ও বিখ্যাত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। বিভিন্ন দেশের লোকের সংস্পর্শে আসায় সে নিজের চেষ্টায় পাঁচ সাতটা ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছিল।

মহারাজের প্লেনখানি দূরে দেখা যাইতেছে। কিন্তু এখনও বিক্রমজিতের সমস্ত কাজ শেষ হয় নাই। পাছে বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে, এইজন্য সরকারী কাগজ-পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবার হুকুম হইয়াছে। বিক্রমজিৎ নিজেই একটা পেট্রোলের টিন

আনিয়া কাগজপত্রের উপর ঢালিয়া দিল। তারপর একটি জ্বলন্ত দেশলাইর কাঠি উহার উপর ফেলিয়া দিয়া, খানিকক্ষণ সেই আগুনের দিকে চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

ইতিমধ্যে প্লেন নামিল। বিক্রমজিৎ ও সুব্রত গিয়া প্লেনে উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্লেনখানি অনন্ত আকাশের বুকে উঠিয়া গেল।

এই কয়দিনের দারুণ পরিশ্রমে বিক্রমজিৎ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই প্লেনে উঠিয়াই সে আরাম কেদারায় গা এলাইয়া দিল, এবং পরক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সুব্রতর মনে হইল, প্লেন যেন ঠিক পথে চলিতেছে না। সে বিক্রমজিৎকে ডাকিয়া তাহার সন্দেহের কথা জানাইল। কিন্তু বিক্রমজিৎ বড় ক্লান্ত। অবসন্ন শরীর বিশ্রাম চায়। তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

সুব্রত সেদিকে খেয়াল না করিয়া কহিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আমার ধারণা ছিল ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট ফেনার আমাদের প্লেনখানি চালিয়ে নিয়ে যাবেন!'

তন্দ্রার ঘোরে বিক্রমজিৎ উত্তর দিল, 'কেন, ফেনার কি প্লেন চালাচ্ছে না?'

'আমার তো মনে হয় না। লোকটা তখন একবার মুখ ফিরিয়েছিল, আমার স্পষ্ট মনে হ'ল এ ফেনার নয়।'

'দূর থেকে তুমি হয়তো ভুল দেখেছো।'

'আমি ভুল করব ফেনারকে ?'—সুব্রত প্রায় লাফাইয়া উঠিল, 'ফেনারের সঙ্গে দুটি বছর ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিলুম, আর আমি ওকে চিনতে ভুল করব !—এ অসম্ভব !'

বিক্রমজিতের কথা কহিতে ভাল লাগিতেছিল না। তবু কহিল, 'হয়ত পরে এয়ার হেড্‌কোয়াটার্স থেকে ঠিক হয়েচে যে ফেনারের বদলে আর একজন যাবে।'

কিন্তু সুব্রত নাছোড়বান্দা, কহিল, 'এ লোকটা তবে কে হ'তে পারে ?'

কথাবার্ত্তায় বিক্রমজিতের ঘুম সম্পূর্ণ ছুটিয়া গিয়াছিল। সে সোজা হইয়া বসিয়া জবাব দিল, 'আমি কি ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের সব পাইলটদের চিনি ?'

সুব্রত একটু অপ্রস্তুত হইল ; তবু কহিল, 'আমিও যে সবাইকে চিনি তা নয়। তবে অধিকাংশকেই চিনি। কিন্তু এ লোকটাকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'হয়ত যাদের তুমি চেনো না, এ তাদেরই একজন। কিন্তু সে যাক্। প্লেন পেশোয়ারে পৌছুলে পরে, ইচ্ছা হয়, তুমি এর সঙ্গে আলাপ কোরো।' এই বলিয়া সমস্ত তর্কবিতর্কের শেষ করিয়া দিবার জন্যই বিক্রমজিৎ আবার চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

সুব্রতর সন্দেহ তখনও যায় নাই। সে অনেকটা আপন মনেই কহিল, 'ও যে দিকে যাচ্ছে, তাতে আমরা যে কোনকালে পেশোয়ারে পৌঁছব এমন তো মনে হয় না।'

বিক্রমজিৎ চুপ করিয়া রহিল। তাহার কেমন একটা বিশ্বাস ছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহারা পেশোয়ারে পৌছিবেই। তা ছাড়া পেশোয়ারে পৌছিবার তাহার বিশেষ কিছু তাড়াও ছিল না। কেহ তাঁহার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিয়া নাই। আসল কথা বিক্রমজিৎ লোকটি একটু নির্লিপ্ত ধরণের। কোন আকস্মিক দুঃখে সে যেমন বিচলিত হয় না, তেমনি অতি আনন্দেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। সংসারের প্রতি তাহার যে কোন অশ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়; খুব শ্রদ্ধাও যে ছিল তাহাও নয়। সে সংসার হইতে একটু দূরে-দূরে থাকিতেই যেন ভালবাসিত।

কিন্তু হঠাৎ আরোহীদের পেটে কি রকম মোচড় দিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিল, প্লেন এইবার নামিতেছে। সুব্রত জানালা দিয়া তাকাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, চেয়ে দেখুন।'

বিক্রমজিৎ মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল এবং দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। সত্যি এ তো পেশোয়ার নয়! কোথায় চারিদিকে সারি সারি মিলিটারী ক্যাম্প দেখা যাইবে, তা নয়, এ যে একেবারে পাহাড়ের রাজ্য! যে দিকে দৃষ্টি যায় কেবল ঢেউএর মত পাহাড়ের পর পাহাড় স্থির কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দূরে বড় বড় গাছও দেখা যাইতেছে। কিন্তু এখানে তো নামিবার জায়গা নাই। তবে প্লেন নীচের দিকে নামিতেছে কেন?

প্লেন ততক্ষণে সোঁ সোঁ করিয়া নামিয়া চলিয়াছে। বিক্রমজিৎ কহিল, 'দেখেচো, লোকটা নাবতে যাচ্ছে ?'

সুব্রত বাধা দিয়া কহিল, 'অসম্ভব ! এতটুকু জায়গায় ও যদি নাবতে যায়, তা'হলে প্লেন চুরমার হ'য়ে যাবে।'

কিন্তু সুব্রতের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। চালক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ওই সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যেই নামিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে অনেকগুলি লোক জড়ো হইয়া প্লেনখানিকে ঘিড়িয়া দাঁড়াইল।

চালক লোকগুলিকে কি একটা আদেশ দিল। অমনি কয়েকজনে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং একটু পরেই বড বড় পেট্রোলের টিন কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতে লাগিল।

বিক্রমজিৎ তাহাদের দেশী ভাষা—পুস্তু কিছু কিছু জানিত। সে একটা লোককে ডাকিয়া দু' একটা প্রশ্ন করিল, কিন্তু সে লোকটা তাহার একটি কথারও জবাব দিল না। এমন সময় চালক তাহাদের সামনে আসিয়া নিঃশব্দে একটি পিস্তল বাড়াইয়া ধরিল। তারপর তেল ভর্ত্তি হইতেই প্লেন আবার আকাশে উঠিল। তখন বেলা দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে, কেহই কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। তবে এটা তাহারা ঠিক বুঝিল যে, তাহাদেরে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। —কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ?

সুব্রত কহিল, 'আমার কি মনে হয় জানেন ? আমাদেরে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে টাকার লোভে। কিছুদিন আটকে রেখে বাড়ীতে চিঠি দেবে টাকার জন্য। টাকা এদের হাতে এসে পৌঁছুলেই আমাদের ছেড়ে দেবে।'

সীমান্ত প্রদেশে এই জাতীয় মানুষ চুরি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বিক্রমজিৎ অন্যমনস্কের মত সুব্রতের কথায়ই সায় দিল। ইহা ছাড়া অন্য কি কারণই বা হইতে পারে ? ব্যক্তিগত শত্রুতা বা প্রতিহিংসার কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ বিক্রমজিৎ বা সুব্রত কেহই চালককে চেনে না। চেনা ত দূরের কথা, কখনও দেখেও নাই।

ঘটনার গতি দেখিয়া বিক্রমজিৎ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সে ততক্ষণ কতকগুলি কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উপর বিভিন্ন ভাষায় নিজেদের বিপদের কথা লিখিয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। উদ্ধারের চেষ্টা হিসাবে ইহা অতি সামান্য। কিন্তু মানুষ তবু আশা করে, যদি···

সমস্ত বিকালবেলাটা ধরিয়াই প্লেন একটানা গতিতে উড়িয়া চলিল। কোথাও মুহূর্ত্তের জন্য থামিবার লক্ষণও দেখা গেল না। তাহারা কোথায় চলিয়াছে, কেন চলিয়াছে—সবই রহস্যময়। এ এক আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গিয়াছে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। লোকটার কি মতলব তাহাও বুঝা যাইতেছে না।

প্রথমে মনে হইয়াছিল, অর্থের জন্য চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু এখন আর তাহাও মনে হয় না। অর্থের জন্যই যদি হইবে, তবে এত দূরে লইয়া আসিবার কি প্রয়োজন? হাঁ, আর একটা কারণ হইতে পারে, সুব্রত যাহা বলিতেছিল, লোকটার মাথা হয়ত খারাপ। কিন্তু মাথা খারাপ হইলেও বড় আশ্চর্য্য রকমের মাথা খারাপ! এর কাজগুলি তো সব প্ল্যান-বাঁধা। বস্কুল হইতে যতগুলি প্লেন ছাড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই প্লেনখানি সব চাইতে উঁচুতে উঠিতে পারে। সে এইখানিই বাছিয়া লইয়াছে। তাহা ছাড়া, পথের মধ্যে পেট্রোল লওয়া······নাঃ, সবই যেন বড় অদ্ভুত লাগিতেছে!

বিক্রমজিৎ নিজে কিছু কিছু বিমান চালনা জানিত। বিলাতে থাকিতে কিছুদিন ট্রেনিং নিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই বিমান চালনার স্বল্প জ্ঞান দিয়া তাহারা কোন্ দিকে চলিয়াছে, কত বেগে চলিতেছে, তাহার কিছুই সে ঠিক করিতে পারিল না। সূর্য্য দেখিয়া অবশ্য আন্দাজি খানিকটা দিক্ ঠিক করা যায়। তাহাতে এই পর্য্যন্ত অনুমান হয় যে, প্লেনখানি মোটামুটি পূব দিকে চলিয়াছে।

প্লেন তখন এত উঁচু দিয়া যাইতেছিল যে, নীচের সবই আবছা এবং অস্পষ্ট মনে হইতেছিল। শুধু এইটুকু বোঝা যায়, নীচে যতদূর দৃষ্টি যায় তাহার সমস্তটাই পর্ব্বত-সঙ্কুল।

সূর্য্যের তেজ যতই পড়িয়া আসিতে লাগিল, প্লেনও যেন ততই উপরে উঠিতেছিল। অস্ত-রবির শেষ রশ্মিটি আসিয়া তাহাদের জানালায় যেন লাল রঙের আবির মাখাইয়া দিল। দু'জনের দেহেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছে। বুকটা যেন অকারণে বেশী ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে। হয়ত অনেক উঁচুতে উঠিলে অমন হয়। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। চালক তখনও নিদ্রাহীন—প্লেন সোঁ সোঁ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ একসময় বিক্রমজিতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জানালার কাঁচের মধ্য দিয়া তাকাইয়া দেখিল, তখনও ভোর হয় নাই। অথচ অনুজ্জ্বল আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সামনে পিছনে যতদূর দেখা যায়, কেবল বরফের রাজ্য। সীমাহীন পর্ব্বত বরফের টুপি পরিয়া যেন অনন্ত কাল ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। সেই ম্লান আলোকে সবই কেমন যেন মায়াময় মনে হইতে লাগিল।

বিক্রমজিৎ পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই ঘুরিয়াছে। তাহার মনের মধ্যে একটি সহজ কবিত্ব বোধ ছিল,—প্রাকৃতিক দৃশ্যমাত্রই তাহাকে আকর্ষণ করিত। কিন্তু এ দৃশ্য, সাধারণ জগতে যাহা দেখা যায়, তাহা হইতে কত পৃথক্! এই তুষারের দেশে আসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতেছে, এমন দৃশ্য সে আগে আর কখনও দেখে নাই। কে জানে, এ কোন্

পর্ব্বত-শ্রেণী ? হয়ত তিব্বতের কোন এক অজানা জায়গায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে! তাহার একবার ইচ্ছা হইল, সুব্রতকে ডাকিয়া এই দৃশ্য দেখায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল,—আহা! বেচারী হয়ত ইহা দেখিয়া আনন্দ পাইবে না। তা'ছাড়া জাগিয়া উঠিলেই তাহার মনে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ভাবনা আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিবে। তাই সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্লেন তখনও পূরাদমে চলিতেছে। কিন্তু আর সে নিশ্চয়ই বেশী দূর যাইতে পারিবে না। পেট্রোল নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। একটু একটু করিয়া ক্রমে ভোরের আলো দেখা দিল। কে যেন শুভ্র তুষার গালিচার উপরে অনেকখানি লাল রং ঢালিয়া দিল।

হঠাৎ প্লেনখানি বিষম দুলিয়া উঠিল। কি হইল ঠিক করিয়া বুঝিবার আগেই একটা প্রবল ঝাকানি দিয়া প্লেনখানি বরফের উপর নামিয়া পড়িল। আগের বার নামিবার সময় চালক যে অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখাইয়াছিল, এবারে তাহার কিছুই দেখাইতে পারিল না। হঠাৎ ঝাকানি লাগায় সুব্রত জাগিয়া উঠিল। আচমকা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রথমে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু অবস্থাটা ঠাহর হইতেই সে লাফ দিয়া উঠিল এবং এক ঝটকায় দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

'একবার যখন মাটিতে পা দিয়েছি, তখন বাছাধন পাইলটকে আমি দেখে নেব! দেখি ওর রিভলভারের দৌড় কতদূর!...' বলিতে বলিতে সুব্রত পাইলটের দিকে ছুটিল।
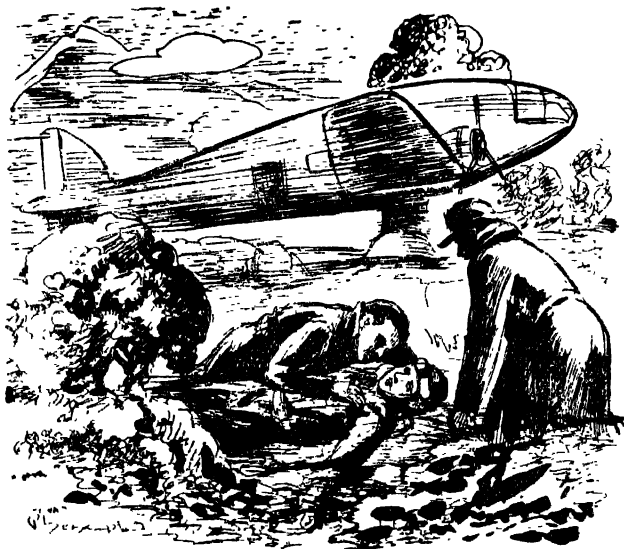
বিক্রমজিৎ বাধা দিয়া কি একটা বলিতে গেল। কিন্তু সুব্রত শুনিল না; ছুটিয়া গিয়া ককপিটের মধ্যে মাথা গলাইয়া দিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই একেবারে দৌড়িয়া আসিল, কহিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু! শীগ্‌গীর আসুন—দেখে যান, লোকটা বোধ হয় মরে গেছে!'

সুব্রতকে আগাইয়া যাইতে দেখিয়া বিক্রমজিৎও তাহার পিছু পিছু গিয়াছিল। সুব্রতের কথা শুনিয়া চালকের সীটের কাছে আসিল। সত্যই লোকটা অত্যন্ত অদ্ভুত ভাবে পড়িয়া আছে। তাহার মাথা স্টিয়ারিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হাত দুইটা নীচের দিকে অত্যন্ত আল্‌গাভাবে ঝুলিতেছে। দেহ স্থির, নিঃস্পন্দ!

বিক্রমজিৎ সন্তর্পণে লোকটার বুকের কাছে হাত দিয়া পরীক্ষা করিল। না, এখনও প্রাণ আছে! তাহারা দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ককপিট হইতে বাহির করিয়া আনিল। বাহিরে তখন ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল বেগে বহিতেছে। কাছাকাছি কোন গাছপালা নাই, তাই কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না।

বিক্রমজিৎ বলিল, 'চল, একে প্লেনের ভিতরে নিয়ে শুইয়ে দিই। তা'ছাড়া আমরা আর কিই বা করতে পারি। ফার্ষ্ট এইড্ দেবার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত নেই।'

দুইজনে চালকের অসাড় দেহটাকে কোনমতে টানিয়া প্লেনের ভিতরে লইয়া গেল। সুব্রত খুঁজিয়া ছোট একশিশি ব্র্যাণ্ডি জোগাড় করিল। বিক্রমজিৎ বলিল, 'ভালই হয়েচে। ব্র্যাণ্ডি পেলে বোধ হয় কতকটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে···'

হইলও তাহাই। একটু ব্র্যাণ্ডি মুখে ঢালিয়া দিবার কিছুক্ষণ পরেই লোকটা চোখ মেলিয়া তাকাইল।

কিন্তু তাহার দৃষ্টিকে কোন মতেই স্বাভাবিক মানুষের দৃষ্টি বলা চলে না। তারপর হঠাৎ সে নিজের মনেই বিড়বিড় করিয়া কি কহিতে লাগিল।

লোকটা জাতিতে তিব্বতীয়। বিক্রমজিৎ তিব্বতীয় ভাষা অল্পস্বল্প বুঝিত। তাই ওর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ভাঙ্গাভাঙ্গা তিব্বতীতে জিজ্ঞাসা করিল, ও কি বলিতে চায়।

বিক্রমজিৎকে কথা বলিতে শুনিয়া লোকটা হঠাৎ যেন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। গল-গল করিয়া একটানা কি কতকগুলা বলিয়া গেল। কথাগুলাও খুব স্পষ্ট নয়। সুব্রত কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিক্রমজিৎ মাঝে মাঝে দু-একটা কথা কহিতেছিল।

তারপর একসময় লোকটা হঠাৎ যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। বিক্রমজিৎ আর একটু ব্র্যাণ্ডি তাহার মুখে ঢালিয়া দিল। কিন্তু এবারে ব্র্যাণ্ডিতে কিছুই ফল হইল না। দু'এক ফোঁটা রক্ত তাহার কস বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। লোকটা একবার যেন কি একটা ইঙ্গিত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ঘুম যেমন ধীরে ধীরে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, লোকটাও যেন তেমনি একটা প্রবল ঘুমের ঘোরে ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস স্তিমিত হইয়া আসিল। তারপর লোকটা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বাহিরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। আর প্লেনের ভিতরে একটি মৃতদেহ সামনে লইয়া বিক্রমজিৎ ও সুব্রত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল!

লোকটার মৃত্যুতে দুজনেই যেন কিছুকালের জন্য কেমন হতভম্ব হইয়া গেল। ওর উপর সুব্রতের রাগ ছিল প্রচণ্ড। যতক্ষণ ও প্লেন চালাইতেছিল, ততক্ষণ সুব্রতের কেবলই মনে হইতেছিল, ওকে একবার বাগে পাইলে একেবারে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। সেই লোকটাই যখন অসাড় দেহে তাহাদের সামনে পড়িয়া আছে, তখন তাহার মনের সেই উত্তাপ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। বিক্রমজিৎই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিল, কহিল, 'ও মরবার আগে বলেছে যে, কাছেই সাংগ্রিলা নামে একটি বৌদ্ধ-বিহার আছে। আমাকে বার বার ক'রে অনুরোধ করেছে সেখানে যেতে।'

লোকটাকে ঠিক চোখের সামনে অমন করিয়া মরিতে দেখিতে সুব্রত খানিকটা বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অন্তিম অনুরোধের কথা শুনিয়া সে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া কহিল, 'ওখানে যাবে না আরও কিছু! ওর মতলব নিশ্চয়ই ভাল নয়। যখন দেখলে যে নিজের দ্বারা তো আর প্ল্যান হাসিল হবে না, তখন ভাঁওতা দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চায়।'

বিক্রমজিৎ কহিল, 'তা যেন বুঝলুম, কিন্তু এই অজানা অচেনা জায়গায় আমরা আর যাবোই বা কোথায়? কোথায় এসেছি, কোন্ দিকে গেলে সভ্যদেশ মিলবে, কিছুই তো আমরা জানিনে।'

সুব্রত মনে মনে বিক্রমজিতের যুক্তি স্বীকার করিল, কিন্তু তাহার রাগ কমিল না। বরং নিজেদেরে যতই অসহায় মনে হইতে লাগিল, তাহার রাগও সেই পরিমাণে বাড়িয়া গেল। তাই বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিল, 'ওর কথা শুনে যদি স্বর্গে যেতে হয়, তাতেও আমি নারাজ। আমরা নিজেরাই আশ্রয় খুঁজে নিতে পারব।'

সুব্রতের রাগ দেখিয়া বিক্রমজিৎ হাসিল, কহিল, 'বেশ তো, তুমিই বল না কোথায় যাওয়া যায়? কিন্তু যাই করো, বেরিয়ে পড়তে হ'লে এখনই বেরিয়ে পড়া ভাল। না হ'লে আশ্রয় যদি শেষ পর্য্যন্ত খুঁজে না-ই পাওয়া যায়, আর এইখানেই যদি রাত্রিবাসের জন্য ফিরে আসতে হয়, তা'হলে বেলাবেলি ফিরে আসাই ভাল। রাত হয়ে গেলে হয়ত আমাদের এই আশ্রয়টিকেও খুঁজে পাবো না; তখন ভারী বিপদে পড়তে হবে; কাজেই সময় নিয়ে কাজ করা ভালো।'

বাস্তবিক এ ছাড়া করবারই বা কি আছে! কাজেই শেষ পর্য্যন্ত বিক্রমজিতের পরামর্শই লইতে হইল। ঠিক হইল, সাংগ্রিলার সন্ধানই করিতে হইবে।

তাহারা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় পাহাড়ের আড়ালে হঠাৎ মানুষের শব্দ শুনিয়া তাহারা চমকাইয়া উঠিল। একটু পরেই পাহাড়ের বাঁকে একদল পার্ব্বত্য লোক দেখা গেল। তাহারা সংখ্যায় দশ বারো জন, সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী চীনাম্যান।

বিক্রমজিৎ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'বোধ হচ্ছে যেন এরা সাংগ্রিলা থেকেই আসচে। কিন্তু যেখান থেকেই আসুক, ভগবান ভাল সময়েই ওদের জুটিয়ে দিয়েছেন। এদের কাছেই পথের কথা জিজ্ঞাসা করা যাবে।'

চীনা ভদ্রলোকটি তাহাদের দিকেই আগাইয়া আসিতে-ছিলেন। বিক্রমজিৎ চীনদেশীয় অভ্যর্থনার নিয়ম-কানুন জানিত। তাই সেও অগ্রসর হইল।

সামনাসামনি আসিতেই চীনা ভদ্রলোকটি তাহার ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া মাথা নিচু করিয়া অভিবাদন করিলেন। বিক্রমজিৎও প্রতি-নমস্কার করিল, এবং কি রকম ভাবে কথা আরম্ভ করিবে ভাবিয়া ঠিক করিবার আগেই চীনাম্যানটি পরিষ্কার ইংরাজীতে বলিলেন, 'আমি সাংগ্রিলার বৌদ্ধ-বিহার থেকে আসচি।'

বিক্রমজিৎ এবং সুব্রত অবাক হইয়া গেল, এমন জনমানব-বর্জ্জিত বরফের দেশে এমন বিশুদ্ধ পরিষ্কার ইংরাজী-জানা চীনাম্যান আসিল কি করিয়া!

বিক্রমজিৎ একটু হাসিয়া ইংরাজীতেই নিজেদের দুরবস্থার কথা জানাইল। কিন্তু সেই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াও চীনাম্যানটির মুখে কোনও ভাব পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গেল না। শুধু কহিলেন, 'আশ্চর্য্য ব্যাপার তো!...' বলিয়া তিনি ভাঙ্গা প্লেনটার দিকে একবার তাকাইলেন।

একটু পরেই আবার বলিলেন, 'আমার নাম চাং।' তারপর সুব্রতকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার বন্ধুর এবং আপনার নাম জানতে পারি কি?'

দু'জনেই হাসিয়া উঠিল, বিক্রমজিৎ কহিল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,—আমার নাম বিক্রমজিৎ রায়, বস্কুলে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের রিপ্রেজেনটেটিভ ছিলুম। আর ইনি শ্রীযুক্ত সুব্রত সেন, আমার সহকারী এবং বন্ধু—'

চাং ঈষৎ মাথা নোয়াইয়া চীনা কায়দায় উভয়কে অভিবাদন করিলেন।

প্রাথমিক পরিচয়ের পর বিক্রমজিৎ কাজের কথা পাড়িল, কহিল, 'বুঝতেই তো পারছেন কি রকম বিপদে আমরা পড়েছি। এখন আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে সাংগ্রিলাতে পৌঁছুবার পথ বাৎলে দেন—'

বিক্রমজিৎ কথাটা শেষ করিতে পারিল না। চাং আগেই বলিলেন, 'তার কিছু প্রয়োজন হবে না। এই সামান্য পথটুকু আমি নিজেই আপনাদের নিয়ে যেতে পারব।'

বিক্রমজিৎ চাংএর সৌজন্যে একটু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, 'না, না—আপনার অত কষ্ট করার কিচ্ছু দরকার নেই। আর আপনি যখন বল্‌ছেন পথ অতি সামান্যই, তখন বলে দিলে আমরা নিজেরাই যেতে পারবো। এমনিতেই আপনার কাজে অনেকটা দেরী করিয়ে দিলুম।'

কিন্তু চাং বিনয়ের অবতার। কহিলেন, 'আমার কাজ অতি সামান্য, সেজন্য আপনাদের লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। তা'ছাড়া পথ অল্প হলেও সহজ নয়। আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারলে সুখী হ'ব।'

ইহার পরে আর রাজী না হইয়া পারা যায় না। চাংএর সঙ্গে যে সব তিব্বতীরা আসিয়াছিল, তাহারা অল্প কিছু খাবার এবং কিছু ফল আনিয়াছিল। চাং সেগুলি অতিথিদের দিলেন। সামনে আহার্য্য পাইয়া তাহারা বুঝিতে পারিল, তাহাদের কি পরিমাণ ক্ষুধা পাইয়াছিল। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সবাই রওনা হইল।

পথে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সুব্রত অনেকটা হঠাৎই বলিয়া উঠিল, 'মিষ্টার চাং, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সাংগ্রিলাতে নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা সেজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। সেখানে কিন্তু বেশীদিন আমাদের থাকা হবে না। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব সভ্য জগতে ফিরে যেতে চাই।...' তাহার কথায় একটু উগ্ররকমের ঝাঁজ ছিল।

চাং উত্তর করিলেন, 'সুব্রত বাবু, আপনি কি স্থির জানেন যে, যেখানে আমরা এখন যাচ্ছি, সে জায়গাটা যথেষ্ট পরিমাণে সভ্য নয় ?'

চাং এই কথাদ্বারা বিদ্রূপ বা ভৎর্সনা ইহার কোন্‌টা করিতে চান, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু সুব্রত আহত হইল। একটু উষ্ণ হইয়াই জবাব দিল, 'আপনাদের সাংগ্রিলার কথা বলতে পারিনে। তবে যে জগতে আমরা এতকাল বাস ক'রে এসেছি, এবং যে সভ্যতার ভিতরে আমরা মানুষ হয়েছি, আমরা সেখানেই ফিরে যেতে চাই। অবশ্য আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন, তার জন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ; তবে আর একটু উপকার যদি করেন, তাহ'লে সত্যি-সত্যি চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকব।'

চাং জিজ্ঞাসু চোখ তুলিয়া একবার তাকাইলেন মাত্র, কোন প্রশ্ন করিলেন না। সুব্রতই আবার কহিল, 'মিষ্টার চাং, আমাদেব দেশে ফিরবার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে আপনাকে। হাঁ ভাল কথা, এখান থেকে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে কতদিন লাগে আপনি বলতে পারেন কি ?'

চাং সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, 'সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই।'

সুব্রত আবার কহিল, 'আচ্ছা, ফিরে যাবার জন্য পথ-প্রদর্শক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ? অবিশ্যি গাইড এবং

পোর্টারদের সঙ্গে কি ক'রে দরদস্তুর কর্তে হয়, আমি নিজেও তার কিছু কিছু জানি। কিন্তু আপনাদের সাহায্য পেলে সবদিক থেকেই সুবিধা হয়।'

বিক্রমজিতের মনে হইল, সুব্রত যেন ফিরিবার তাড়ায় সমস্ত শোভনতার গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতেছে। ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাংগ্রিলার বিহারে লইয়া যাইতেছেন। পথের মধ্যেই দেশে ফিরিবার জন্য এতখানি তাড়াহুড়া করার কোনই অর্থ হয় না। বিক্রমজিৎ বিরক্ত হইল।

চাংও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, 'দেখুন, আপনাদের দেশে ফিরে যাবার সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌তে পারিনে। তবে যেখানে এখন আপনারা যাচ্ছেন, সেখানে আপনাদের সেবার কোন ত্রুটিই হবে না। আমার তো মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত আপনাদের অসন্তোষের কোন কারণই থাকবে না।'

'শেষ পর্য্যন্ত!' সুব্রত বাধা দিয়া উঠিল; 'শেষ পর্য্যন্ত অসন্তোষের কোন কারণ থাকবে না,—এর মানে?'

এবারে বিক্রমজিৎ বাধা দিল। কহিল, 'কি ছেলেমানুষি কচ্ছো? দেশে ফিরবার কথা সেখানে গিয়েও তো আলোচনা হ'তে পারবে! এত ব্যস্ত হবার কি আছে?'

বিক্রমজিতের কথায় সুব্রত চুপ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে গজ্‌ গজ্‌ করিতে লাগিল।

সামনে পিছনে, চারিদিকে বরফ স্তূপাকার হইয়া জমিয়া আছে। সূর্য্যের আলোতে সমস্ত পার্ব্বত্য ভূমি ঝলমল করিতেছে। এই নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রতা দেখিয়া মানুষের মন

আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। বিক্রমজিৎ কতকটা সসম্ভ্রম বিস্ময়ের সঙ্গে সামনের গিরিশৃঙ্গের দিকে তাকাইল। চাং মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'পাহাড়ের শোভা দেখছো?'

বিক্রমজিৎ বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, 'অপূর্ব্ব মিষ্টার চাং, অপূর্ব্ব! এমন আমি আর কখনও দেখিনি। পর্ব্বতটার নাম কি?'

'আমরা একে বলি কারিকল।'

'এ নামের কোন পর্ব্বতের কথা তো কখনও শুনিনি। এটা উঁচু হবে কতটা আন্দাজ?'

'আটাশ হাজার ফিটের কিছু বেশী।' চাং মৃদুস্বরে বলিলেন।

বিক্রমজিৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'বলেন কি? এতো উঁচু! আটাশ হাজার ফিট! তাহ'লে, আমাদের গৌরীশৃঙ্গের পরেই বলুন।' একটু থামিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা মেপেচেন কারা?'

চাং উত্তর দিলেন, 'আমরা।'

'আমরা!—মানে সাংগ্রিলার মঠের লোকেরা?'

চাং হাসিলেন, কহিলেন, 'তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে, বিক্রমজিৎ বাবু! সন্ন্যাসীদের কি অঙ্কশাস্ত্র জানা নিষেধ?'

'না, না,—তা নয়……' বিক্রমজিৎ লজ্জিত হইয়া চুপ করিল।

নানারকম বন্ধুর পথ ঘুরিয়া অবশেষে তাহারা পাহাড়ের চূড়ায় উপস্থিত হইল। আর একটা বাঁক ঘুরিতেই এক আশ্চর্য্য দৃশ্য তাহাদের চোখে পড়িল। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পাহাড়ে ঘেরা বিস্তৃত শ্যামল উপত্যকা। বরফের সমুদ্রে যেন

সবুজ একটি দ্বীপ। তাহার একপাশে সিঁড়ির মত পাহাড় একটার-পর আর একটা নীচু হইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই গায়ে সাংগ্রিলার বৌদ্ধ-বিহার। বাড়ীটি দেখিলেই মনে হয়,
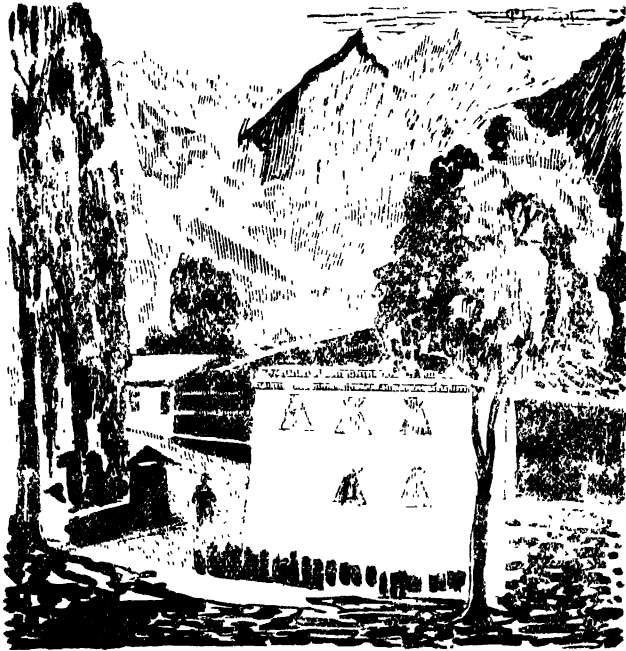
অতি আধুনিক কায়দায় কংক্রিট দিয়া তৈরী, অথচ গড়ন সেকেলে ধরণের। সামনে প্রশস্ত নাটমন্দির। একটু দূরে বিরাট দীঘি। খুব ছোট একটি ঝর্ণা আসিয়া দীঘির

মধ্যে পড়িয়াছে। দীঘির তীরের কাছে কোথাও কোথাও পদ্ম ফুটিয়া আছে। অন্ততঃ হাজার মাইল বরফ পার না হইয়া যে দেশে আসা যায় না, সেখানে এই রকম বাড়ী দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। বিক্রমজিৎ এবং সুব্রত দুইজনেই বিস্মিত হইল।

যখন তাহারা সাংগ্রিলা-বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। এই দুইদিনের পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় বিক্রমজিৎ ও সুব্রত দু'জনেই অত্যন্ত ক্লান্ত। চাং তাড়াতাড়ি স্নানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আশ্চর্য্য! প্রত্যেক ঘরের আসবাব-পত্র হইতে কল-বাথরুম পর্য্যন্ত বিলাতী কায়দায় সাজানো। স্নানের ঘরে ঝাঝ্‌রি, ঠাণ্ডা জল, গরম জলের পাইপ—কিছুরই অভাব নাই। কে বলিবে তাহারা কোন বড় সহরের একটা নামকরা হোটেলের মধ্যে আসে নাই! এ সবই কল্পনার অতীত!

টেবিলের উপর খাবার দেওয়া হইল। চাং সঙ্গে বসিলেন। চাংএর খাওয়া অত্যন্ত পরিমিত। এত অল্প খাইয়া মানুষ বাঁচে কি করিয়া, ইহা ভাবিয়া সুব্রত অবাক্ হইয়া গেল। খাইতে খাইতে চাং এক সময়ে বলিলেন, 'এখন তো দেখলেন সুব্রত বাবু, আমাদের যতটা অসভ্য ভেবেছিলেন, আমরা আসলে কিন্তু ততটা অসভ্য নই। সভ্যতা আমাদেরও কতকটা আছে!'

সুব্রত লজ্জিত হইয়া কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু গলায় আটকাইয়া গেল বলিয়া আর বলা হইল না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

একটু পরে বিক্রমজিৎ জিজ্ঞাসা করিল, "মিষ্টার চাং, একটা জিনিষ বড় অদ্ভুত ঠেকছে। এতক্ষণ এসেছি, অথচ আপনি এবং দু' একজন চাকর-বাকর ছাড়া আর কাউকেই তো এখানে দেখলুম না। আপনাদের মঠে কি বেশি লোক নেই? মঠের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন না!'

চাং ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন, 'আপনার প্রশ্ন অত্যন্ত ব্যাপক। আপনি ঠিক কি জানতে চান শুনলে উত্তর দিতে সুবিধা হয়।'

'প্রথমতঃ আপনাদের এখানে কত লোক বাস করেন এবং তা'রা কোন্ দেশের লোক?'

চাং কহিলেন, 'যারা সম্পূর্ণ লামাধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ জনের বেশি হবে না। তবে এছাড়া আরও কয়েকজন আছেন, যারা এখনও লামাধর্ম্মে দীক্ষিত হননি।' এই বলিয়া একটু হাসিয়া আবার কহিলেন,—'এই যেমন আমি। তবে আমরাও এককালে লামা হব। আর আমাদের দেশের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এই সাংগ্রিলাই আমাদের দেশ। কিন্তু আপনি যে অর্থে কথাটা জিজ্ঞেস করলেন, তার জবাব দিতে গেলে বলতে হয়,

সব দেশের লোকই আমাদের মঠে আছেন। তাদের ভিতরে চীনা ও তিব্বতীর সংখ্যাই বেশি।'

বিক্রমজিৎ আবার প্রশ্ন করিল, 'আপনাদের প্রধান লামা কোন্ দেশী লোক? তিনি কি চীনা, না তিব্বতী?'

এবারে চাংএর মুখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, 'মহাস্থবির চীন বা তিব্বতের লোক নন।'

চাং আসল কথাটা এড়াইয়া গেলেন। তিনি যে কোন্ দেশের লোক, সে সম্বন্ধে চাং কিছুই বলিলেন না।

সুব্রত মাঝখান হইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঙ্গালী কেউ এখানে আছেন?'

চাং হাসিলেন, কহিলেন, 'আছেন বৈ কি দু'একজন।'

বিক্রমজিৎ এই কথা শুনিয়া খুসী হইল। কেন যে খুসী হইল, তাহার কারণ সে নিজেও বলিতে পারে না।

খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। চাকর আসিয়া টেবিল পরিষ্কার করিয়া লইয়া গেল। চাং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা সিগারেট খান?' বিক্রমজিৎ ঘাড় নাড়িয়া নিষেধ করিল। সুব্রত জানাইল যে, সে খায়।

চাং ইঙ্গিত করিতেই একজন ভৃত্য অতি দামী এক প্যাকেট সিগারেট লইয়া আসিল। সুব্রত এবারে বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই পাহাড়ের অরণ্যের মধ্যে সে আর যাহাই প্রত্যাশা করুক না কেন, দামী বিলাতী

সিগারেট কখনই আশা করে নাই। তাই সে অজস্র ধন্যবাদের বন্যায় চাংকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। চাং শুধু মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমাদেরও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়।'

তারপর তাহাদের বিশ্রাম করিবার ঘর দেখাইয়া দিয়া চাং সেদিনকার মত বিদায় লইলেন।

আবার সন্ধ্যার দিকে চাং দেখা দিলেন। গল্পগুজব চলিতে লাগিল। সুব্রতের ভাল না লাগিলেও, বিক্রমজিৎ এখানে আসিয়া খুসী হইয়াছে। চারিদিকে এমন একটা সুনিবিড় শান্তি ছড়াইয়া আছে যে, সমস্ত মন আপনিই ভরিয়া যায়। এ জায়গার রীতিনীতি সে কিছুই জানে না। ইহারা কেমন লোক তাহাও জানা নাই। যতদূর মনে হয়, ইহারা ভাল লোক। তবে এখানে সব-কিছুর চারিদিকেই যেন রহস্য ঘিরিয়া আছে। চাংও যেন সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চান না। কিন্তু কি সে রহস্য? সে চাংকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের প্রচলিত ধর্ম্মমত কি?'

প্রশ্ন শুনিয়া চাং কহিলেন, 'আপনার প্রশ্নটা বড় জটিল। সহজে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, আমরা সংযমের পক্ষপাতী। কোন রকম আতিশয্যই আমরা পছন্দ করিনে, এমন কি সংযমের আতিশয্যও নয়। এই হ'ল আমাদের আসল মত। আপনি শুনলে অবাক হবেন, আমরা ধর্ম্মের আতিশয্যও সহ্য করিনে।

এই পাহাড়ে দেশে প্রায় হাজার তিনেক লোকের বাস ; আমরাই তাদের চালাই। কিন্তু আমাদের শাসনের মধ্যেও সংযম আছে। আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন ? হাঁ, শাসনের মধ্যেও আমরা অসংযমের পরিচয় দিইনে।

'আমাদের প্রজাদের উপর খুব বেশি নিয়মানুগত্যের চাপ আমরা দিইনে এবং শাসনের সময়েও দয়া বা কঠোরতা এর কোনটারই আতিশয্য প্রকাশ পায় না। এতে প্রজারাও শান্তিতে আছে, আমাদেরও হাঙ্গামা কমে গেছে। আমাদের এখানকার সবাই মোটামুটি সৎ, মোটামুটি পরিশ্রমী এবং তা'তেই মোটামুটি খুসী।'

চাংএর কথা শেষ না হইতেই সুব্রত ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, 'আপনাদের মঠের সন্ন্যাসীদেরও কি এই নিয়ম ?'

চাং শান্ত অথচ কঠিন স্বরে কহিলেন, 'মাপ করবেন, এ বিষয়ে আমি কিছু বল্‌তে পারবো না।'

বিক্রমজিৎ এবং সুব্রত দুইজনেই বুঝিয়াছিল যে, এখানে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহার সম্বন্ধে কৌতূহল হইলেও তাহা নিবৃত্ত করিবার পথ নাই ; কারণ, জিজ্ঞাসা করিবার লোকের মধ্যে এক চাং। তিনি যে কোন্ কথার উত্তর দিবেন আর কোন্ কথার উত্তর দিবেন না, তাহা বলা শক্ত। তাই অনেক প্রশ্ন করিয়াও তাহারা ঠিক মত উত্তর পায় নাই ; কখনও বা অত্যন্ত ভাসাভাসা উত্তর পাইয়াছে।

কিন্তু চাংএর শেষ কথায় সুব্রত বিশেষ রাগ করিল না। কারণ এখানকার সন্ন্যাসীরা কি রকম ভাবে চলে না চলে,

তাহাতে তাহার কি আসে যায়.! সে শুধু দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত। তাহাদেরে দেশে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইলে, সে আর একটি কথাও কহিবে না।

সুব্রত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আপনাদের ধর্ম্মমত আপনাদেরই থাক মিষ্টার চাং! কিন্তু আমাদের দেশে ফিরবার কথা হয়ত খুব অবান্তর আলোচনা হবে না—' বলিয়া সে বিক্রমজিতের মুখের দিকে তাকাইল।

চাং প্রশ্নটা শুনিয়া একটুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। দূরের জানালাটার মধ্য দিয়া বাহিরের ক্ষীণ আলো আসিতেছিল। জানালার গা বাহিয়া একটা আইভি লতা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। বাতাসে সেটি অল্প অল্প দুলিতেছে। চাং একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর অত্যন্ত আস্তে, প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, 'সুব্রত বাবু, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করা একেবারেই বৃথা।'

তিনি 'আমাকে' কথাটার উপর বেশ্ জোর দিলেন। একটু থামিয়া আবার কহিলেন, 'তবে আমার মনে হয়, এখনই কিছু করা সম্ভব হবে না।'

সুব্রত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, 'সম্ভব হবে না? কেন হবে না? আমাদের যেমন ক'রেই হোক কালকে এখান থেকে রওনা হ'তেই হবে। আজকেই লোক জোগারের চেষ্টা করা চাই।'

সুব্রতের শেষের কথাগুলি এত জোরে বাহির হইয়াছিল যে, সে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হইল।

চাং কিন্তু চটিলেন না, তেমনি শান্তভাবে বলিলেন, 'আমি তো আগেই বলেছি, এতে আমার কোন হাত নেই।'

এই মৃদু কথা কয়টির মধ্যে এমন একটা ভর্ৎসনার সুর ছিল যে, তাহারা দুইজনেই তাহা অনুভব করিল। সুব্রতও অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কহিল, 'বেশ মানলুম, আপনার কোন হাত নেই। কিন্তু কিছু উপকার হয়ত আপনিও আমাদের করতে পারেন, —অবশ্য যদি ইচ্ছা করেন।'

শেষের কথাটায় সুব্রত ইচ্ছা করিয়াই একটু শ্লেষ মিশাইয়া দিল। চাং তাহা গায়ে মাখিলেন না, কহিলেন, 'বলুন, আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি ?'

'আমাদের যাবার সময় ম্যাপ নিলে ভাল হ'ত। আপনাদের এখানে ভাল ম্যাপ আছে ?'

'আছে।' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর।

সুব্রত খুসি হইয়া কহিল, 'বেশ ভাল। আশা করি তার দু' একটা আমাদের ধার দিতে আপনাদের আপত্তি হবে না। ভাল কথা, সব চাইতে কাছাকাছি টেলিগ্রাফ ষ্টেশন এখান থেকে কতদূর হবে ?'

চাংএর ভাবলেশহীন মুখে এবারে বিরক্তির ছায়া ফুটিয়া উঠিল। বিক্রমজিৎ বুঝিল চাং মনে মনে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু চাং সুব্রতের প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না; চুপ করিয়াই রহিলেন।

সুব্রত আবার গরম হইয়া উঠিল, কহিল, 'আচ্ছা, আপনারা দরকারী জিনিষপত্র আনান কেমন করে? যে সব জিনিষ এখানে দেখলুম, তা এখানে পাওয়া যায় না নিশ্চয়। বাইরের সভ্য জগৎ থেকে তা আনতে হয়। কিন্তু সভ্য জগতের সঙ্গে আপনারা যোগ রাখেন কি করে?'

সুব্রত জবাবের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু চাং এবারেও সম্পূর্ণ নীরব।

একটু কাল সবাই চুপচাপ—শুধু দেওয়ালের ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। সুব্রত হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, বেশ উষ্ণ স্বরেই বলিল, 'মিষ্টার চাং, আপনি কি আমার কথার জবাব দেবেন না? আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনাদের এখানকার ঘরবাড়ি কংক্রিট চূণ বালি থেকে আরম্ভ ক'রে দেওয়ালগিরি খাট পালং মায় ঐ ঘড়িটা পর্য্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে আমদানী করা। কিন্তু কেমন ক'রে? কি ক'রে আপনারা আনালেন এসব?'

চাংএর কাছ হইতে এবারেও কোন উত্তর পাওয়া গেল না দেখিয়া সুব্রত আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। বিক্রমজিৎকে লক্ষ্য করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আমি বলে বলে হার মেনে গেলুম। আপনি দেখুন না চেষ্টা ক'রে। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক কালই রওনা হ'তে হবে।—বিক্রমজিৎ বাবু, আমি বলছি…'

রাগে এবং ক্ষোভে সে আর কথাটা শেষ করিতে পারিল না। ছুটিয়া ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। সুব্রতের কথাটা বিক্রমজিতের মনে খুব লাগিয়াছিল। তাহার নিজের যদিও সাংগ্রিলা খুবই ভালো লাগিয়াছিল, তাহা হইলেও সুব্রতের দুঃখ সে বুঝিল। তাহার বয়স অল্প, সবে ইউনিভারসিটি হইতে বাহির হইয়াছে। তাহার বাপ-মা ভাইবোন আছে। তাহারা ওর পথ চাহিয়া রহিয়াছে। ওর পক্ষে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য উতলা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

সুব্রত বাহির হইয়া যাইতেই বিক্রমজিৎ খাড়া হইয়া বসিল, এবং কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সোজাসোজি চাংকে বলিল, 'মিষ্টার চাং, আমার বন্ধুটি একটু উতলা হয়ে পড়েছেন। তবে সে জন্য তাকে খুব দোষও দেওয়া যায় না। কিন্তু সে কথা যাক্। আসল কথা হচ্ছে, যেমন ক'রেই হোক আমাদের দেশে ফিরে যেতে হবে, এবং একথাও ঠিক্ যে আপনাদের সাহায্য না পেলে এখান থেকে এক-পা চলাও অসম্ভব। অবশ্য সুব্রতের কথামত কালই যাওয়া সম্ভব নয়। যোগার-যন্ত্র করতে কিছুদিন সময় নেবেই। সেজন্য কিছু এসে যাবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি বলছেন এবিষয়ে আপনার কোন হাত নেই; তাহ'লে যার হাত আছে, তার সঙ্গে আমাদের একবার দেখা করিয়ে দিন্।'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া চাং বলিলেন, 'আপনার বন্ধুর চাইতে আপনার ধৈর্য্য এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই বেশী।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি যা জানতে চেয়েছি, তার উত্তর তো আপনি দিলেন না!'

চাং হাসিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিলেন। হাসিটা এতই কৃত্রিম যে, স্পষ্টই বুঝা গেল চাং হাসির আড়ালে কথাটাকে চাপা দিতে চাহিতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলিলেন, 'সময়মত আপনারা সাহায্য পাবেন বৈকি! তবে লোক ঠিক করবার অনেক অসুবিধাও আছে জানেন তো! যদি তাড়াহুড়া করেন—'

বিক্রমজিৎ বাধা দিয়া বলিল, 'আমি তো তাড়াহুড়া করবার কথা বলিনি! আমি শুধু কি ক'রে লোক যোগাড় করা যেতে পারে, তা জানতে চেয়েছিলাম।'

'দেখুন, এর আরও একটা দিক আছে। আমার যতদূর মনে হয়, এখানকার কেউ এ জায়গা ছেড়ে যেতে রাজি হবে না। কিসের লোভেই বা যাবে বলুন! তা'রা এখানে বেশ সুখে আছে।'

বিক্রমজিৎ চট্ করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু একটু পরেই কহিল, 'কেন? আজকে ভোর বেলাই তো দেখ্‌লুম, আপনি কয়েক জন লোক নিয়ে কোন এক জায়গায় রওনা হয়েছিলেন।'

'আজকে ভোরের কথা বলছেন ? সে আলাদা ব্যাপার।'

'আলাদা ব্যাপার কেন ? আপনি কি আজ ভোরে কোথাও যাচ্ছিলেন না ?'

চাং এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। হঠাৎ বিক্রমজিতের মাথায় একটা অদ্ভুত কথা খেলিয়া গেল। সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'আমি এখন বুঝতে পারছি মিষ্টার চাং, ভোরে কোথায় আপনারা যাচ্ছিলেন। আমাদের সঙ্গে যে পথে আপনাদের দেখা হয়েছিল, সেটা মোটেই দৈবক্রমে নয়। আপনারা আমাদের আসবার কথা জানতেন। তাই আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলেন! নয় ? কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কি ক'রে আপনারা আমাদের আসবার কথা জানলেন ?'

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। ভৃত্য বাতি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। লণ্ঠনের মৃদু আলো চাংএর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ স্বভাবতই ভাবলেশহীন। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন চারিদিক ঢাকিয়া গিয়াছে, তখন লণ্ঠনের ম্লান আলোকে তাহাকে একটি পাথরের মূর্ত্তির মতই মনে হইতেছিল। শান্ত চোখ দুটি তুলিয়া তিনি বিক্রমজিতের দিকে তাকাইলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আপনি বুদ্ধিমান, কাজেই ঠিক মতই আন্দাজ করেছেন। কিন্তু আপনার অনুমান সবটাই সত্য নয়। আশা করি

আপনার বন্ধুর কাছে আপনার এই সন্দেহের কথা বলবেন না।' একটু থামিয়া ঈষৎ ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, সাংগ্রিলাতে আপনাদের ভয়ের কোনই কারণ নেই।'

'কিন্তু আমরা তো বিপদের আশঙ্কা করছিনে, মিষ্টার চাং! আমাদের দেশে ফিরে যেতে অনর্থক দেরী হ'তে পারে ভেবে আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি।'

'আপনার উদ্বেগের কারণ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ফিরতে খানিকটা দেরী তো হবেই।'

'দেরী যদি অল্প দিনের জন্য হয় এবং আপনারা যদি সাহায্য করেন, তা'হলেই আমরা কৃতজ্ঞ হব।'

চাং হাসিলেন; কহিলেন, 'যতদিন এখানে আছেন, দেখবেন আপনাদের কোন রকম অসুবিধা হবে না।'

বাহিরে তখন ঘনায়মান অন্ধকার একটু একটু করিয়া ফিকা হইয়া আসিতেছিল। জানালার পাশে আইভি লতাটা আবার বাতাসে দুলিতেছে। বিক্রমজিৎ আসিয়া জানালার আলিসায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। দূরে কারিকল পর্ব্বতের তুষার-শৃঙ্গে কি একরকম অস্বচ্ছ নীল আলো দেখা যাইতেছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া খেলিয়া গেল। কাছেই একসারি পাইন গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—তাহার পাতাগুলি শীতের হাওয়ায় ঝির ঝির করিয়া উঠিল।

সুব্রত তাহার ঘরে বসিয়া হয়ত কোন বই পড়িতেছে। কিম্বা অন্য কিছু করিতেছে। কিন্তু বিক্রমজিৎ তেমনি জানালা ধরিয়া বাহিরের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। পাহাড়ের চূড়াটা ক্রমেই যেন নীল রঙের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। চারিদিকে কুয়াসার জলবাষ্প সেই আলোকের ম্লান দীপ্তিকে আরো যেন মায়াময় করিয়া তুলিয়াছে। আকাশের তারাগুলি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারাও যেন এই মধুর সন্ধ্যায় নিমেষহীন চোখে পৃথিবীর এই মোহময় সৌন্দর্য্যের দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিয়াছে।

তারপর এক সময়ে যেখানটায় পাহাড় এবং আকাশ একসঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, সেইখানটায় চাঁদ উঠিল—আবছা, নীল চাঁদ! নীল জ্যোৎস্না বিক্রমজিতের মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সে তন্ময় হইয়া গেল।

সহসা মৃদু শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল। চাং কাছে আসিয়া বলিলেন, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আমাদের দেশী ভাষায় কারিকল শব্দের অর্থ হ'ল—নীল চাঁদ!'

• •

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। যতই দিন যাইতেছিল, বিক্রমজিতের ততই এই জায়গাটা ভাল লাগিতেছিল। কিন্তু সুব্রতকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইল। এখান থেকে যাওয়ার সম্বন্ধে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিবার জন্য সে বহুবার চাংএর

সঙ্গে তর্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। চাংএর স্বভাবের মধ্যে একটা অদ্ভুত জোর ছিল, যাহার কাছে মাথা না নোয়াইয়া পারা যায় না। সুব্রত নিজেই লোক যোগাড় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহার মস্ত একটা অসুবিধা হইল এই যে, সে এদেশী লোকের কথা একেবারেই বুঝিতে বা বলিতে পারে না। শুধু আকারে-ইঙ্গিতে এসব কথা চলে না। তাই তাহার চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত কোনই ফল হয় নাই।

বিক্রমজিৎ ইহাদের ভাষা কিছু কিছু জানে। সে ইচ্ছা করিলে একটা কিছু করিতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য সে কোনই চেষ্টা করে না দেখিয়া সুব্রতের রাগ হয়। সে ভাবে বিক্রমজিতের দেশে ফিরিবার ইচ্ছা মোটেই নাই। কিন্তু বিক্রমজিৎ বেশ ভালো করিয়াই জানে, মঠের কর্ত্তাদের অনুমতি ব্যতীত তাহাদের পক্ষে কিছু করা মোটেই সম্ভবপর হইবে না। সুব্রতকে সে-কথা সে অনেকবার বলিয়াছে। কিন্তু সুব্রত তাহার কথা পূরাপূরি মানিতে চাহে না; বলে, —'আমাদের চেষ্টা করিতে দোষ কি?'

একদিন সকাল বেলা সুব্রত চাংকে ধরিয়া বসিল; কহিল, 'আর দেরী নয় মিষ্টার চাং! আজই চলুন লোকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া যাক'—অবশ্য আপনার যদি আমাদের যাওয়ার বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকে।'

সে এমন ভাবে কথাটা বলিল যেন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল! কিন্তু চাং নির্ব্বিকার রহিলেন; কহিলেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। খোঁজ ক'রে কোন ফল হবে না। আমার বিশ্বাস এখান থেকে কোন লোক আপনাদের সঙ্গে যেতে রাজি হবে না।'

সুব্রত বলিল, 'কিন্তু মিষ্টার চাং, আপনি কি মনে করেন, আপনার এই উত্তরেই আমরা সন্তুষ্ট থাকবো?'

'কিন্তু আমি তো কোন পথ দেখতে পাচ্ছিনে।' চাং আস্তে আস্তে বলিলেন।

সুব্রত এবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, 'বেশ! এই যদি সত্যি হয়, তবে এতদিন আপনি আমাদের অনিশ্চিতের মধ্যে রেখেছিলেন কেন?'

চাং তাহার উষ্ণতা দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, আগের মতই মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, 'প্রথমেই আপনাদের হতাশ করা ঠিক মনে করিনি। এই ক'দিন বিশ্রামের পর আপনারা এখন সুস্থ হয়েছেন। আশা করি এ আঘাত আপনাদের এখন আর ততটা লাগবে না—'

সুব্রত কি যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু বিক্রমজিৎ বাধা দিয়া কহিল, 'না, মিষ্টার চাং, কথাটার শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল। আচ্ছা, আমাদের দেশে ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?'

চাং হাসিলেন। সে হাসিতে যেন ঘরের বদ্ধ গুমোট অনেকটা কাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, 'দেখুন বিক্রমজিৎ বাবু, আমি আগেও বলেছি, আপনার বন্ধুটির চাইতে আপনি অনেক বেশী ধীর স্থির। ওর মত ব্যস্তবাগীশ হ'লে এসব আলোচনা চলে না। কিন্তু সে যাক। আপনারা ঠিকই অনুমান করেছেন যে, সভ্যজগতের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদান আছে; আমাদের একদল লোক ঠিক করা আছে। তা'রা দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে বছরে একবার ক'রে আমাদের এখানে আসে। এবারে তা'রা যখন আসবে...'

সুব্রত বাধা দিয়া উঠিল, 'কবে তা'রা আসবে?'

চাং সুব্রতকে অগ্রাহ্য করিয়া বিক্রমজিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'কবে তা'রা আসবে, ঠিক ক'রে বলা শক্ত। পথে নানারকম বিপদ আপদ আছে—'

বিক্রমজিৎ কহিল, 'বেশ তো সে সব বাদ দিয়েই বলুন না কবে আন্দাজ তা'রা এসে পৌঁছুতে পারে? আরও একটা কথা, তা'রা আমাদের কতদূর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে?'

'আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব হ'ল একমাস থেকে দু'মাসের মধ্যে। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।'

'তা'রা কি আমাদেরে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না?'

'এ কথার উত্তর তা'রাই দিতে পারে।'

এখনও একমাস হইতে দুইমাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে শুনিয়া সুব্রত হতাশ হইল। তাহার একবার মনে হইল, ইহাও চাং-এর একপ্রকার চাতুরী, তাহাদের ভাঁওতা দিয়া রাখিবার একটা কৌশলমাত্র। কিন্তু ইহার প্রতিকার তো তাহাদের হাতে নাই। সুব্রত অনেকটা বুঝিয়াছিল যে, ইহাদের সাহায্য ছাড়া কোন কিছু করা অত্যন্ত শক্ত। অথচ চাং যে তাহাদের সাহায্য করিতে কেন রাজি হইতেছেন না, তাহারও কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা বৌদ্ধও নয়, সন্ন্যাসীও নয়। তবে তাহাদের এখানে রাখিয়া লাভ কি? মঠের লোকেরা যে তাহাদের এখানে রাখিতে চায়, এমন কথাও তো তাহারা স্পষ্ট করিয়া বলে না; তবে কি সত্য সত্যই লোক যোগাড় করা একান্তই অসম্ভব? কিন্তু সে কথাও বিশ্বাস করা কঠিন।

সেইদিন সন্ধ্যার দিকে সুব্রত পাহাড়তলীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। বিক্রমজিৎ কিছুক্ষণ লাইব্রেরীতে গিয়া বই পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল লাগিল না। শেষকালে বাহিরে দীঘির ঘাটে আসিয়া জলের মধ্যে খানিকটা পা ডুবাইয়া বসিল। এই স্তব্ধ অবসরে কত কথাই না মনে পড়িতেছে! মাত্র এক সপ্তাহ আগে তাহারা কোথায় ছিল, আর আজ তাহারা কোথায়? মনে পড়িল, সেই বিমান চালকটা কি রকম ভাবে মরিয়া গিয়াছিল!

বাতাস লাগিয়া দীঘির কালো জল ছল্ ছল্ করিয়া উঠিতেছে। আজ নির্জ্জন সন্ধ্যায় বিক্রমজিতের মনে পড়িল দেশের কথা। বাংলা দেশ কতদিন সে ছাড়িয়া আসিয়াছে! আর যেন বাংলাকে ভাল করিয়া মনেই পড়ে না। যেন কতদূরে সরিয়া গিয়াছে তার প্রিয় জন্মভূমি!

দূরের বনে কি একটা নাম-না-জানা পাখী হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমজিৎ অতীত স্বপ্ন হইতে বর্ত্তমানের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এই সাংগ্রিলা, কি আশ্চর্য্য দেশ! কি সুস্নিগ্ধ শান্তি! তাহার জীবনের উপর দিয়া নানারকম অশান্তির ঝাপ্‌টা চলিয়া গিয়াছে; এখানে আসিয়া সে যেন ছোটবেলার হারাণো শান্তিময় দিনগুলি ফিরিয়া পাইয়াছে। মনে পড়িল, সে একদিন চাংকে এখানকার লামাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আপনাদের এখানকার লামারা কি করেন?'

চাং উত্তর দিয়াছিলেন, 'তাঁরা আত্মানুশীলন এবং জ্ঞানের চর্চ্চা করেন।'

বিক্রমজিৎ তাহার উত্তরে বলিয়াছিল, 'কিন্তু সে তো বাস্তবিক পক্ষে কিছু করা নয়!'

'তাহ'লে তাঁরা কিছুই করেন না।'

আবার বিক্রমজিতের মন দেশে ফিরিবার ভাবনায় ডুবিয়া গেল। কে জানে কত দিন পরে বাহকদল আসিবে?

হঠাৎ দূরে কোথায় যেন মধুর সুরে তম্বুরা বাজিয়া উঠিল। কালো জলের বুকে আকাশের তারাগুলির ছায়া পড়িয়াছে। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে ছায়াগুলি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া তম্বুরার সঙ্গে তাল দিতে লাগিল।
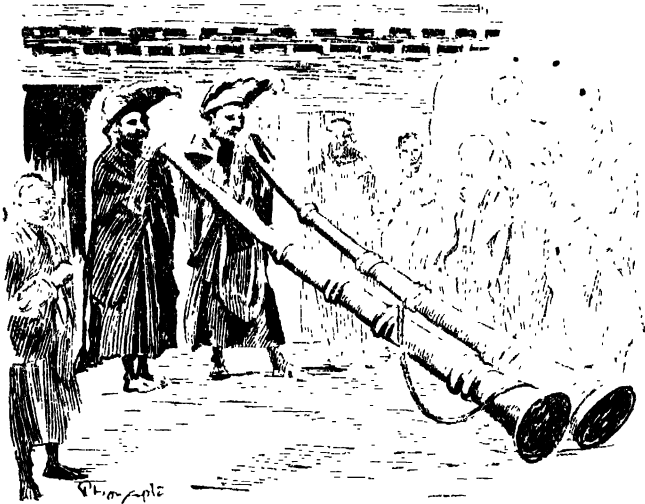
একটু পরেই সেই সঙ্গীত থামিয়া গেল এবং বিক্রমজিৎ অনুভব করিল, কে যেন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাকাইয়া দেখিল, চাং। চাং কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আপনার জন্য আশাতীত সু-খবর নিয়ে এসেছি।'

বিক্রমজিৎ এতক্ষণ যাত্রীদলের কথাই ভাবিতেছিল, তাই কহিল, 'কি! আপনাদের লোকেরা এসেছে নাকি?'

চাং অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, 'না, তার চাইতেও সুখবর। মহাস্থবির আপনাকে স্মরণ করেছেন।'

এই কয়দিনেই বিক্রমজিৎ বুঝিতে পারিয়াছিল, মঠের লোকেরা মহাস্থবিরকে কি রকম শ্রদ্ধা করে। তাই একটু বিস্মিত হইয়াই কহিল, 'মহাস্থবির আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন?—কিন্তু কেন?'

'তিনি দেখা করতে চেয়েছেন, এই কি যথেষ্ট নয়? বিক্রমজিৎ বাবু, এ যে কতবড় সম্মান—'

বিক্রমজিৎ বাধা দিয়া কহিল, 'তা জানি। চলুন যাই।'

চাং আগে, বিক্রমজিৎ পিছনে পিছনে অগ্রসর হইল। বিক্রমজিৎ এই দিকটায় কখনও আসে নাই। বড় বড় ঘর, প্রত্যেকখানিই সাজানো। কিন্তু কোথাও একটি লোক দেখা গেল না। শেষকালে তাহারা ছোট একটি দরদালানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় বড় গম্বুজের উপর প্রাচীন পদ্ধতিতে খিলান দেওয়া ছাদ। মাঝখানে একটা সহস্রদীপ ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলিতেছে। দরদালানের একপ্রান্তে ছোট একটি চাতাল। এই চাতাল পার হইলেই সামনে চন্দনকাঠের বিরাট দরজা। চাং এই দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দরজাটি অল্প একটু খুলিয়া কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আপনি ভিতরে যান, মহাস্থবির আপনার সঙ্গে একাই দেখা করবেন।'

বিক্রমজিৎ প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন হইতে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

বাহিরের উজ্জ্বল আলো হইতে আসিয়া বিক্রমজিৎ হঠাৎ কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। একটু পরে চোখ অভ্যস্ত হইতেই সে দেখিতে পাইল, ঘরটী সম্পূর্ণ অন্ধকার নয়। বেশ প্রশস্ত ঘর, এক কোণে মেজের উপর ছোট একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। আসবাব-পত্র বলিতে ঘরের মধ্যে কিছুই নাই। প্রদীপের পাশেই ছোট্ট একটী মর্ম্মর বেদী। তাহার উপরে গালিচার মত একখানি আসন পাতা এবং সেই আসনের উপর এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী স্থির হইয়া বসিয়া আছেন,—যেন পাথরে খোদিত একটি অপরূপ মূর্ত্তি! সন্ন্যাসীর দেহে বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু জরা তাঁহাকে কাবু করিতে পারে নাই। পরণে অতি সাধারণ গৈরিক বসন, সকল প্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত। একটি উজ্জ্বল দীপ্তি যেন সন্ন্যাসীর সমস্ত দেহকে অনুক্ষণ ঘিরিয়া রহিয়াছে। সেই সৌম্যমূর্ত্তি এবং অলৌকিক জ্যোতি দেখিলে মন যেন আপনি নত হইয়া পড়ে—স্নিগ্ধ শান্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে।

বিক্রমজিৎ নত হইয়া নমস্কার করিল। মহাস্থবির ডানহাতখানি সামান্য একটু তুলিয়া অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। তারপর পরিষ্কার বাংলায় কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ বাবু, ঐ আসনখানিতে বসুন।'

বিক্রমজিৎ বসিল। এই সন্ন্যাসীর কাছে বসিয়া তাহার সমস্ত মন কি এক অপূর্ব্বরসে ভরিয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে কহিল, 'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য। আপনি আমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবেন।'

মহাস্থবির ঈষৎ হাসিলেন, কহিলেন, 'তাই হবে, বিক্রমজিৎ! ভগবান তথাগত তোমার কল্যাণ করুন।' তারপর একটু থামিয়া আবার স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, 'এ ক'দিন এখানে তোমাদের কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'না, আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। মিষ্টার চাং সেদিকে যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রেখেচেন।'

মহাস্থবির এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। উদার দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরব। শেষে মহাস্থবির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ, তুমি হয়তো আশ্চর্য্য হয়েচো, কেন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি...'

বিক্রমজিৎ চুপ করিয়া রহিল। মহাস্থবির কহিলেন, 'আমি শুনেছি তোমরা এই মঠ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে চেয়েছো, অথচ চাং সব সময় তার সদুত্তর দেননি। আজ আমি তোমাকে ডেকে এনেছি তার কারণ হ'ল, আমি তোমাকে সাংগ্রিলার ইতিহাস বলতে চাই।'

মহাস্থবির আবার একটু কাল চুপ করিলেন, বোধ হয় কি বলিবেন, তাহা মনে মনে গুছাইয়া লইলেন।

তারপর তিনি আরম্ভ করিলেন; কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ, তুমি ইতিহাস পড়েছো। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে মধ্যযুগে পূর্ব্ব-এশিয়ায় ও তিব্বতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের একটা ঢেউ এসেছিল।

দলে দলে মিশনারী এসে চীন ও তিব্বতে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেছিলেন। এই মিশনারীদের একটা মস্ত বড় ঘাঁটি ছিল পিকিংএ।

'তখন ১৭০৯ সাল। চারজন মিশনারী পিকিং থেকে তিব্বতের দিকে যাত্রা করেছিলেন। পার্ব্বত্য পথ। নানারকম বিপদ আপদ লেগেই আছে। তা'ছাড়া দুর্গম পথের কষ্ট তো আছেই। ক্রমে তাঁরা পাহাড়ের রাজ্যে এসে পড়লেন। ঝড় বৃষ্টি—দুরন্ত শীত উপেক্ষা ক'রে তাঁরা চলেছেন। কিন্তু এই অমানুষিক পরিশ্রম তাঁদের সহ্য হ'ল না। তিন জন পথের মধ্যেই মারা গেলেন, আর বাকী একজন অতি কষ্টে দৈবানুগ্রহে এই সাংগ্রিলার উপত্যকায় এসে পড়লেন।

'তিনি যখন এখানে এসে পৌঁছান, তখন তিনি মৃতকল্প। দেহের শেষ শক্তিবিন্দুটিও নিঃশেষিত হয়েচে। কিন্তু এখানকার লোকেরা তাঁকে উদ্ধার ক'রে প্রাণপণে তাঁর সেবাযত্ন করল। তাদের অক্লান্ত পরিচর্য্যায় এবং ঐকান্তিক সেবায় তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয়, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ধর্ম্ম-প্রচারে লেগে গেলেন। এখানকার লোকেরা বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহ'লেও তা'রা গোঁড়া নয় এবং এই ধর্ম্মযাজকের কথা তা'রা বেশ মন দিয়েই শুনত। ধীরে ধীরে তাঁর কাজ অগ্রসর হ'তে লাগল, এবং কিছু কিছু লোক তাঁর কাছে দীক্ষাও গ্রহণ করল।

'সে সময়ে এখানে একটা বৌদ্ধ-বিহার ছিল। তিনিও ঠিক করলেন, বৌদ্ধদের মত এখানে একটা খৃষ্টীয় মিশন স্থাপন করবেন। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হ'ল। সেই বৌদ্ধ-বিহারের পাশেই এক খৃষ্টান মিশন স্থাপিত হ'ল। এ হ'ল ১৭২৪ সালের কথা। তাঁর বয়স তখন তিপ্পান্ন বছর।

'ঐ ভদ্রলোকের নাম ছিল শীলার,—তিনি জাতিতে জার্ম্মান। ধর্ম্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করবার আগে তিনি প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপর যখন জার্ম্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাঁধে, তখন তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু যুদ্ধের বীভৎসতা তাঁর মনে এমন এক বিভীষিকার ছায়া এঁকে দেয় যে, যুদ্ধ শেষ হবার পরে তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেলেন না। তিনি যাজকের বৃত্তি নিয়ে চীন দেশে চলে এলেন।

'সাংগ্রিলাতে তাঁর প্রচারকার্য্য ক্রমেই বেড়ে চলল। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানকার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ এবং শীলার নিজে খৃষ্টান হলেও, তাদের সঙ্গে তাঁর কখনও বিরোধ বাঁধেনি। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সবাই তাঁকে সমান শ্রদ্ধা করত,—তিনিও সকলকে সমান স্নেহ করতেন। এখানে এসে তিনি একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু কাঞ্চন তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

'প্রথম প্রথম তিনি তাঁর কাজের বিবরণী পিকিংএ পাঠাতেন ; তখনকার দিনে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা আজকের চাইতে অনেক বেশী কঠিন ছিল। তাই এই সব খবর অনেক সময়েই যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছাত না, পৌঁছালেও অনেক দেরী হ'ত। সে যাই হোক, নানা কারণে রোমের বিশপের ধারণা হ'ল, শীলার ঠিকমত কাজ চালাতে পারছেন না। তিনি আদেশ ক'রে পাঠালেন যে, শীলারকে পত্রপাঠ দেশে ফিরে যেতে হবে।

'বিশপের আদেশ বহন করে চিঠি যখন শীলারের হাতে এলো, তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর বয়স তখন উননব্বুই। এই বয়সে ভঙ্গুর দেহ নিয়ে হাজার মাইলের উপর দুর্গম পার্ব্বত্য পথ পাড়ি দেওয়ার কল্পনাও বাতুলতা মাত্র। কাজে কাজেই তিনি অত্যন্ত নতি স্বীকার ক'রে বিশপের কাছে তাঁর সমস্ত অবস্থার কথা খুলে লিখলেন। শীলার যে ইচ্ছা ক'রে তাঁর ধর্ম্মগুরুর আদেশ অমান্য করেছিলেন তা নয়। তাঁর পক্ষে সে আদেশ পালন করা অসাধ্য বলেই তিনি এইখানে থেকে গেলেন। তা ছাড়া তাঁর নিজের একটা বিশ্বাস ছিল, তাঁর কাজ ফুরিয়ে এসেছে ; আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা যাবেন, এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উপরওয়ালার আদেশ মানা-না-মানার সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে।

'শীলারের দেহে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন একটু একটু ক'রে দেখা দিতে লাগল। তুমি হয়ত ভাবচ, নব্বুইএর কাছাকাছি বয়স হ'ল, তখনও পূরোপূরি বার্দ্ধক্য কি তাঁকে ঘিরে ধরেনি? না, বয়সে বৃদ্ধ হলেও জরা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনি। তার কতগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ সাংগ্রিলা প্রায় আটাশ হাজার ফিট উঁচু। এখানকার বাতাস অত্যন্ত পাতলা হ'লেও এর ভিতরে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশী, তাতে মানুষের তারুণ্য বজায় থাকে। দ্বিতীয় কারণ হল, শীলার এখানে এসে কতকগুলি আশ্চর্য্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করেছিলেন। মানুষের দেহে সেগুলি সঞ্জীবনীর মত কাজ করত।

'বয়সের প্রবীণতা শীলারের মনে এক অদ্ভুত রকমের শান্তি এনে দিয়েছিল। সংসারের সব-কিছু চাওয়া-পাওয়া যেন তাঁর হ'য়ে গেছে। সব-কিছুতেই তার প্রয়োজন আছে, অথচ কোন কিছুই যেন আর তাঁর দরকার নেই। গভীর প্রশান্তির সঙ্গে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন।

'বয়সের জন্য তিনি প্রচার কার্য্যে ক্ষান্ত হলেন। কালে কালে তাঁর অনুগত সেবকেরা তাঁর শিক্ষার কথা ভুলে গেল, কিন্তু তাঁকে ভুলল না। তাঁর বার্দ্ধক্যের স্তব্ধ মধুর দিনগুলিকে তা'রা সেবাযত্ন দিয়ে ভরে তুলল। তাঁর শিষ্যেরা যে ক্রমে ক্রমে আবার বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডীতে চলে গেল, তা' দেখে তিনি প্রথম প্রথম কিছু ক্লেশ বোধ করেছিলেন। কিন্তু তাদের

ভালবাসার প্রলেপে সে ব্যথাও তিনি ভুলে গেলেন। শুধু তাই নয়। এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর সত্যিকারের অন্তরের যোগ ঘটেছিল, তাই ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও তিনি তাদের সঙ্গে এক ভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়লেন। বৌদ্ধ-বিহার এবং খৃষ্টীয় মিশন মিলে এক হ'য়ে গেল।

'এই সময়ে তাঁর বয়স হবে আটানব্বই। কিন্তু তখনও তাঁর কর্ম্ম-ক্ষমতা অটুট ছিল এবং স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত রকমের প্রখর। তিনি তখন বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুরু করেন। তাঁর সমস্ত আলোচনা এবং অনুশীলনের ফলাফল তিনি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তাঁর হাতের লেখা সেই বই এখনও লাইব্রেরী ঘরে আছে। তুমি ইচ্ছা করলে পড়ে দেখতে পারো।

'তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিয়ে যতই আলোচনা করতে লাগলেন, ততই দেখতে পেলেন যে, এর ভিতরে একটি পরম শান্তির বাণী আছে। তাই জ্ঞানার্জ্জনের সাথে সাথে তিনি নিজেকে আরও বেশী প্রস্তুত ক'রে নিতে লাগলেন তাঁর শেষ দিনটির জন্য। কখন সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসবে, এই ভেবে তিনি স্তব্ধ শান্তির সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে থাকতেন। যারা তাঁর মূল শিষ্য ছিলেন, একে একে তাঁরা অনেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন; শুধু দুই একজন অতি বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে রইলেন।

'স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা করত, —প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। তা'রা তাঁর সব রকম প্রয়োজন মিটিয়ে দিত। তা'রা প্রতিদিন অপর্য্যাপ্ত ফলমূল নিয়ে আসত, আর তিনি তাদের প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ করতেন। এই সময় তিনি হিন্দুদের যোগ-অভ্যাস আরম্ভ করেন। সত্যি সত্যি তাঁর জীবনে কর্ম্ম এবং শান্তির এক আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটেছিল, এবং তাই ছিল শীলারের জীবনের বিশেষত্ব।

'—শেষকালে ১৭৮৯ সালের শেষাশেষি জানা গেল যে, শীলারের মৃত্যুকাল আসন্ন।

'আজ এখন যে-ঘরে বসে আমরা কথা বলছি, এই ঘরে তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আসন্ন বিদায়ের কাল গুণতে লাগলেন। তিনি নির্ভীকভাবে মহাপ্রস্থানের জন্য পা বাড়িয়ে দিলেন। তিল তিল ক'রে মৃত্যুর দূত এগিয়ে আসতে লাগল। তখন একে একে অতীত জীবনের ছবি তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। সে ছবি কালের কুয়াসায় ঝাপ্‌সা নয়—জীবনে হয়ত তিনি অনেক ভুল করেছেন, অনেক কিছুই তাঁর জীবনে অপূর্ণ রয়ে গেল। কিন্তু তাতে তাঁর শেষ মুহূর্ত্ত কিছুমাত্র ম্লান হ'ল না। তাঁর জীবনের সব ভুল, সব ত্রুটি, সব ভালো, সব মন্দ—ভগবান তথাগতের চরণে নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে, তিনি মহাযাত্রার জন্য নিজকে দায়মুক্ত করে নিলেন।

'ঐ জানালাটার ভিতর দিয়ে কারিকলের তুষার-শৃঙ্গটা দেখা যায়। তিনি ম্লান অপরাহ্ণের আলোকে সেই শুভ্র তুষারের দিকে চেয়ে থাকতেন। তাঁর মন অনির্ব্বচনীয় রসে ভরে যেত। একটু একটু ক'রে তেল পুড়ে প্রদীপ যেমন এক সময় নিভে যায়, তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর জীবনটিও যেন ওই রকম শান্ত মধুর ভাবেই শেষ হয়।

'কিন্তু মৃত্যুর দেবতা তাঁর দরজার কাছ থেকে ফিরে গেলেন। তখন শীলারের বয়স একশ আট।...'

মহাস্থবির এইখানে চুপ করিলেন। একটু কাল জানালা দিয়া বাহিরের নীরব অন্ধকারের দিকে নিমেষহীন চোখে তাকাইয়া রহিলেন।

তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'মৃত্যু শীলারের কাছ থেকে ফিরে গেল এবং যাবার সময় আশীর্ব্বাদও রেখে গেল তাঁর জন্য। এই সময় থেকেই তিনি অনেকটা দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন। কিন্তু সেকথা আমি পরে বলব। সেরে উঠে তিনি বিশ্রাম খুঁজলেন না, বরং আরও বেশী উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর সেই যোগ-অভ্যাস তখনও চলল এবং তিনি বহুদূর এগিয়ে গেলেন।

'ক্রমে ক্রমে তার মূল শিষ্যদের শেষটিও যখন ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন, শীলার তখনও বেঁচে। সে হল ১৭৯৪ সালের কথা।

'এদিকে তাঁর অস্বাভাবিক পরমায়ু দেখে নানারকম জনশ্রুতি প্রচারিত হ'তে লাগল। তিনি তখন আর বাইরে বেরুতেন না। লোকেরা বলাবলি করত যে, তিনি কারিকলের তুষার-শৃঙ্গে গিয়ে একা একা ধ্যান করেন। তাই তা'রা নানারকম অর্ঘ্য নিয়ে এই পাহাড়ের গোড়ায় রেখে আসত।

'ধীরে ধীরে তিনি তাদের চোখে দেবতা হ'য়ে উঠলেন। তা'রা ভাবত, শীতের হিমেল রাত্রে যখন চারিদিক কুয়াসায় ঢেকে যায়, তখন তিনি একাকী কারিকলের চূড়ায় উঠে আকাশ প্রদীপ জ্বেলে দেন।

'কিন্তু বিক্রমজিৎ, আমার নিজের বিশ্বাস, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সব আশ্চর্য্য জনরব প্রচারিত হয়েছিল, সে সব কিছুই তাঁর ছিল না। এই নিরালা ঘরে বসে তিনি ধ্যান-ধারণায় শান্ত-সমাহিত জীবন যাপন করতে লাগলেন। তবে অসাধারণ অধ্যবসায় এবং সাধনার জোরে তিনি নিজের মনকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছিলেন। এই মনঃসংযমের বলে শুধু মাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করতে পারতেন।

'স্বাভাবিক বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'ল না দেখে তাঁর বিশ্বাস হ'ল যে, মৃত্যু যেমন এখন তাঁর কাছে আসতে দেরী করচে, তেমনি একদিন হয়ত অতর্কিতে এসে হানা দেবে। সেদিন যেন মৃত্যু-দূত এসে না দেখে যে তিনি প্রস্তুত নেই।

'কিন্তু তাঁর জীবনের মেয়াদ যে আরও কতদিন তাও তো জানা নেই। তাই তিনি সর্ব্বদাই তাঁর দেবতার দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ ক'রে যেতে লাগলেন।

'কাজে তার অলসতাও যেমন ছিল না, তাড়াহুড়া করবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। যে জীবন ভগবানের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন, সেটি তো সম্পূর্ণ ভোগ করাই হয়েচে—এখন যেটা রইল সে হ'ল উপরি পাওনা। এই সময়ে তিনি নানারকম গবেষণামূলক বই লিখতে আরম্ভ করেন। সে সব বই মঠের লাইব্রেরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে।

'১৮০৪ সালে সাংগ্রিলার উপত্যকায় আর একজন বিদেশী যুবক এসে উপস্থিত হন। শীলার যেমন একদিন নিতান্ত অবসন্ন ভগ্নদেহে এখানে এসেছিলেন, এই বিদেশীও তেমনি এমন অবস্থায় এখানে এসে পৌঁছেছিলেন, যখন তাঁর জীবনীশক্তি প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এঁর বাড়ী ছিল অষ্ট্রিয়ায়, নাম ছিল হেনেল। হেনেল সৈন্যদলে কাজ করতেন। তিনি ইটালীতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং তারই ফলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে জীবনের বাঁধা পথ থেকে একেবারে বাইরের জগতে এসে পড়েন। তিনি যে কি ক'রে সাংগ্রিলাতে এসে উপস্থিত হ'ন, সে একটা রহস্য। কোন্ পথ দিয়ে, কেমন ক'রে তিনি এখানে এসেছিলেন, সেকথা তার নিজেরই বিশেষ কিছু মনে ছিল না।

'এদেশে আসবার অল্প কিছুকালের মধ্যেই তিনি এখানকার স্বর্ণখনির সন্ধান পান। গৃহহীন ও বিত্তহীন হয়ে তাঁর মনে যেটুকু বৈরাগ্য জন্মেছিল, সোনার খনি আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে তা উবে গেল। তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা হ'ল, কি ক'রে প্রচুর পরিমাণে সোনা নিয়ে দেশে ফিরবেন।

'কিন্তু দেশে তিনি ফেরেননি। একটা আশ্চর্য্য ঘটনায় তাঁর সব রকম হিসাব-নিকাশ বেঠিক হ'য়ে গেল। তিনি শীলার সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি শুনলেন এবং তাঁর কেমন কৌতূহল হ'ল। তিনি ঠিক করলেন শীলারের সঙ্গে দেখা করবেন।

'সেদিনটা ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। শীলার সবে ধ্যান ক'রে উঠেছেন। ঘরে ধূপধূনার গন্ধ ছড়িয়ে আছে। এমন সময় হেনেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কি এক পরম শুভ মুহূর্ত্তে দু'জনের দেখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দু' একটার বেশী কথা হয়নি, কিন্তু হেনেল তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ত্যাগ ক'রে শীলারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

'হেনেল একদিকে যেমন করিৎকর্ম্মা লোক ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁর বুদ্ধিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনিই প্রথম এই মঠের লাইব্রেরী গড়ে তুললেন। বাইরের জগৎ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনাবার বন্দোবস্ত করবার জন্য তিনি একবার পিকিং যান। তার পরে আর দ্বিতীয় বার এই সাংগ্রিলা ছেড়ে কোথাও তিনি যাননি।

'বাহকের সাহায্যে বাইরে থেকে জিনিষ-পত্র আনাবার বন্দোবস্ত তিনি কর্‌লেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে একটা মস্ত ভয় রয়ে গেল। পাছে বাইরের লোক কোন প্রকারে সাংগ্রিলার স্বর্ণখনির সন্ধান পায়, তাহ'লে আর রক্ষা থাকবে না। পৃথিবীর চারদিক থেকে স্বর্ণলোভী বণিকের দল এসে এদেশকে বিপর্য্যস্ত ক'র্‌বে। এদেশের শান্তি ও সৌন্দর্য্য সমস্ত নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে। তাই তিনি প্রথম প্রথম পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, পাহারার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন……'

বিক্রমজিৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত এই রোমাঞ্চকর ইতিহাস শুনিতেছিল। মহাস্থবির একটু থামিতেই প্রশ্ন করিল, 'কেন নিষ্প্রয়োজন?'

মহাস্থবির বলিলেন, 'নিষ্প্রয়োজন এই জন্য যে, সাংগ্রিলাকে প্রকৃতিই বাইরের অত্যাচারের হাত থেকে অনেকটা রক্ষা করেছেন। অন্ততঃ হাজার মাইল বরফের দেশ পার না হয়ে বাইরের জগৎ থেকে এখানে আসবার কোন উপায় নেই। তাই বাইরের বিস্তর লোক হঠাৎ এখানে এসে পড়বে, এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কালেভদ্রে কেউ কখনও আসে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ম করা হ'ল, বাইরের যে কোন লোকই এখানে বিনা বাধায় আসতে পারবে— শুধু একটি মাত্র সর্ত্তে।

'তারপর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আরও কিছু বিদেশী লোক এখানে এসেছিলেন। তাদের ভিতরে অনেকে এই মঠে আছেন। এখানকার নিয়ম ছিল, বহির্জগৎ থেকে কেউ এলেই তাকে সাদরে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা। আজ পর্য্যন্ত সে নিমন্ত্রণ কেউ প্রত্যাখ্যান করেননি।

'এই মঠের যত-কিছু বৈশিষ্ট্য, তার প্রায় সব-কিছুর মূলেই ছিলেন হেনেল। সত্যি কথা বলতে কি, এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শীলারের যতখানি গৌরব, হেনেলের গৌরব তার চাইতে তিলমাত্র কম নয়। সমস্ত আশ্রমটি যাতে সুশৃঙ্খল ভাবে চলতে পারে, তার সব ব্যবস্থাই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ক'রে গিয়েছিলেন।'

বিক্রমজিৎ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তিনি মারা গেছেন নাকি ?'

মহাস্থবির ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ বৎস, তার মৃত্যু ঘটেছে। তিনি মারা গেছেন বলা হয়ত ঠিক হবে না, তিনি নিহত হয়েছিলেন। যে বছর তোমাদের ভারতবর্ষে সিপাহি-বিদ্রোহ হয়, সেই বছর তিনি মারা যান। মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগে একজন চীনা শিল্পী তাঁর একখানি ছবি এঁকেছিল। তাঁর সেই ছবিখানি ঐ দেয়ালে টাঙানো আছে,—' এই বলিয়া তিনি দেওয়ালে লম্বিত একখানা ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

বিক্রমজিৎ প্রদীপটি হাতে লইয়া ছবিখানির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। একজন সুগঠিত-দেহ যুবকের ছবি। অত্যন্ত সুপুরুষ, বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশী হইবে না। প্রদীপের আলো ছবির মুখে পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ মৃদু আলোতেও সেই কমনীয় মুখ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ম্ময় দেখাইতে লাগিল। বিক্রমজিতের মনে খটকা লাগিল। মহাস্থবির বলিয়াছেন, হেনেল যখন ১৮০৪ সালে সাংগ্রিলাতে প্রথম আসেন, তখন তিনি যুবক। আবার এদিকে বলিতেছেন যে, এই ছবিখানি তাঁহার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগেকার প্রতিকৃতি! তিনি যদি সিপাহি-বিদ্রোহের বছরে মারা যান, তবে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঁচাত্তর কি আশি হওয়া উচিত। কিন্তু এ ছবি তো খুব যুবা বয়সের। এ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। তাই সে প্রশ্ন করিল,—'আপনি বললেন, এই ছবি হেনেলের মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেকার?'

'হাঁ...'

'হেনেল মারা গেছেন ১৮৫৭ সালে?'

মহাস্থবির ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

'আর একটি প্রশ্ন। তিনি যখন ১৮০৪ সালে প্রথম এখানে আসেন তখন তিনি যুবক ছিলেন?'

'হাঁ,—যৌবনের জোয়ারে তাঁর দেহ তখন ঝলমল করছে।'

একটুকাল বিক্রমজিৎ কোন উত্তর করিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'হেনেল কি ক'রে মারা গেলেন?'

পলকের জন্য মহাস্থবিরের প্রশান্ত মুখের উপর সূক্ষ্ম একটি শোকের ছায়া পড়িল। অতীতের একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনা যেন একটু কালের জন্য তাঁর সমগ্র চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, 'একজন ইংরাজ তাঁকে মেরে ফেলে। লোকটা দৈবক্রমে সাংগ্রিলাতে এসেছিল এবং যথানিয়মে তাকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল।

'কিন্তু কয়েকদিন পরেই হেনেলের সঙ্গে তার বচসা হয়। হেনেল সাংগ্রিলার উপত্যকায় আশ্রয় পাবার একটি মাত্র সর্ত্তের উল্লেখ করেন। কিন্তু ইংরাজ সন্তানের তা' মনঃপূত হ'ল না। সে হেনেলকে গুলি ক'রে হত্যা করে...' বলিতে বলিতে মহাস্থবির হঠাৎ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিলেন। একটা বিভীষিকার ছায়া যেন মুহূর্ত্তকালের জন্য তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। তিনি চক্ষু বুজিলেন। একটু পরে কহিলেন, 'তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছো সেই সর্ত্তটি কি?'

বিক্রমজিৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে কতকটা অনুমান করিয়াছে; কহিল, 'বোধ হয় এই নিয়ম ছিল যে, কেউ একবার এখানে এলে সে আর ফিরে যেতে পারবে না।'

মহাস্থবির অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, 'তোমার অনুমান সত্য, বিক্রমজিৎ! কিন্তু এই কাহিনী শোনবার পরে আর··· আর কোন কথা তোমার মনে উঠ্‌চে না?'

মহাস্থবির চুপ করিলেন। তাঁহার শেষ কথাটি কি যেন এক অদ্ভুত রহস্যের ইঙ্গিত দিয়া গেল, বিক্রমজিৎ ঠিক বুঝিতে পারিল না। এই রোমাঞ্চকর অতি প্রাচীন কাহিনী যেন একটা বিশেষ রূপ ধরিয়া তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন শীলার অশরীরী দেহ ধরিয়া এই প্রায়ান্ধকার কক্ষের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কি একটা উজ্জ্বল সত্য তাহার চক্ষের সামনে ফুটি ফুটি করিয়াও যেন ফুটিতে পারিতেছে না।

তারপর হঠাৎ জানালা দিয়া একটা দমকা হাওয়া প্রবেশ করায় প্রদীপের শিখাটি বারবার কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনের অন্ধকারে যে রহস্য এতক্ষণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল, তাহার উপর এক ঝলক উজ্জ্বল আলো আসিয়া পড়িল। সে একবার স্থিরদৃষ্টিতে মহাস্থবিরের মুখের দিকে তাকাইল, একবার হেনেলের ছবিটার দিকে নজর পড়িল। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, 'না—না, এ যে একেবারে—একেবারেই অসম্ভব ··'

মহাস্থবির মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিক্রমজিৎ, বল, কি অসম্ভব!'

মহাস্থবিরের কণ্ঠে কি ছিল জানি না, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া বিক্রমজিৎ হঠাৎ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তারপর অভিভূতের মত সে মহাস্থবিরের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, 'মহাস্থবির! আপনি···আপনিই ফাদার শীলার···আপনি এখনও বেঁচে আছেন!'

কিছুক্ষণ দুইজনই নীরব। মহাস্থবিরের কণ্ঠস্বর একটি গানের মত বহুক্ষণ ধরিয়া বিক্রমজিতের কানে বাজিতে লাগিল। এই যে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া আছেন, ইহাও যেন সেই গানের একটি অঙ্গ। মানুষের সাধারণ কণ্ঠস্বর যে এত মিষ্টি হইতে পারে, নিজের কানে না শুনিলে বিক্রমজিৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। মহাস্থবির বিক্রমজিতের মনেব কথা বুঝিলেন, কহিলেন, 'সঙ্গীত-চর্চ্চা আমাদের এখানকার একটি বিশেষ সাধনা। ফরাসী গাইয়ে চোপিনের নাম নিশ্চয়ই তুমি শুনেছো। তার একজন সাক্ষাৎ শিষ্য এখানে আছেন। ভারী সুন্দর পিয়ানো বাজান তিনি—'

বিক্রমজিৎ কহিল, 'আমি নিজেও গানের কিছু কিছু চর্চ্চা করতুম। চোপিনের অনেকগুলি গৎ আমি জানি।'

এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। একটু থামিয়া বিক্রমজিৎ পুনরায় কহিল, 'সাংগ্রিলার সর্ত্ত অনুসারে আমাদের তা'হলে এখানেই চিরাদন থাকতে হবে?'

তার পরেই ঈষৎ ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু পৃথিবীতে এত লোক থাক্‌তে আমাদের দুজনকেই বিশেষ ক'রে বেছে আনা হয়েচে কেন, তা' তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

মহাস্থবির হাসিলেন ; কহিলেন 'কারণ ? হ্যাঁ, কারণ আছে বৈকি ! মঠে সন্ন্যাসীর সংখ্যা যাতে ঠিক থাকে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হয়। গত বিশ বছরেব মধ্যে আমাদের এখানে কোন যাত্রী আসেনি। ১৯১০ সালে একজন জাপানী তীর্থঙ্কর এসেছিলেন এবং সেই শেষ।

'এখানে যারাই আসেন, তা'রাই যে দীর্ঘজীবন লাভ করেন, এমন নয়। এমন কি নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না, কে দীর্ঘজীবী হবেন এবং কে হবেন না। দীর্ঘায়ু লাভের যে প্রণালী আমরা বার করেছি, তা' সবার উপর সমান কাজ করে না। এখানকার উচ্চতা, বাতাসের প্রচুর অক্সিজেন—এরা যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে। তবে স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু খুব দীর্ঘজীবী নয়। তার কারণ বংশ-পরম্পরায় তা'রা এই দেশের জলবায়ুতে মানুষ। তাই এটা তাদের উপকারও করে না, অপকারও করে না। একশ বছরের বেশী বাঁচে এরকম লোক এখানে খুবই কম। এদের চাইতে চীনারা কিছু ভাল। তবে এতদিনের পরীক্ষায় দেখা গেছে, জীবনকে দীর্ঘ করবার যে পদ্ধতি আমরা বহু গবেষণায় আবিষ্কার করেছি, তাতে বাঙ্গালীর দেহই সাড়া দেয় সব চাইতে বেশী।

'একটু আগেই তো তোমাকে বলেছি গত বিশ বছরের মধ্যে এখানে কোন বিদেশী আসেনি এবং এর মধ্যে আমাদের মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করেছেন।

'স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে টুলু নামে একটি যুবক ছিল; যেমন তার সাহস তেমনি তার বুদ্ধি। সে আমাদের মঠে খুব যাওয়া-আসা করত। সে একবার প্রস্তাব করল যে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে বাইরে থেকে এরোপ্লেনে ক'রে লোক নিয়ে আসা চলতে পারে। তার এই প্রস্তাব যুগান্তকারী হলেও আমরা মেনে নিয়েছিলাম।'

এইখানে বিক্রমজিৎ বাধা দিয়া কহিল, 'তাহ'লে আপনারা এই মঠ থেকেই আমাদের আনিয়েছেন?'

মহাস্থবির বলিলেন, 'ঠিক ওরকম ভাবে বললে আমাদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। প্রস্তাবটা টুলুর কাছ থেকেই এসেছিল এবং আমরা তা'তে বাধা দিইনি। সে আমেরিকায় যেয়ে বিমান চালনা শেখে। তার পরের ইতিহাস তো তুমি জানই।'

'জানি বটে! তবে এর ভিতরেও একটু কিন্তু থেকে যায়। আমরা দু'জন বাঙ্গালী বক্সুলে আছি, সেখানে তখন দারুণ বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া ইন্দোরের মহারাজের একখানা এরোপ্লেন আমাদের ব্যবহারের জন্য পাওয়া গেছে, এত সব খবর সে জানল কি ক'রে?'

'এর সবটাই যোগাযোগ। দৈব যদি টুলুকে এমন ভাবে সাহায্য না করত, তবে তাকে হয়ত আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হ'ত। হয়ত একেবারেই সম্ভব হ'ত কি না কে জানে!' মহাস্থবির আবার চুপ করিলেন।

বিক্রমজিৎ একটু ভাবিয়া কহিল, 'কিন্তু এ সব-কিছুর মূল উদ্দেশ্য কি?'

মহাস্থবির চোখ তুলিয়া তাকাইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য সেই করুণ চক্ষু দুইটি হইতে বিক্রমজিৎ তাহার দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। তিনি কহিলেন, 'তোমার প্রশ্ন শুনে আজ সত্যিই আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। এখানে যারাই এসেছে, তাদের কাছেই আমি এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ইতিহাস বলেছি। আমাদের সাধনা এবং উদ্দেশ্যের কথা বুঝিয়েছি। কিন্তু কেউই তোমার মত সরল আগ্রহে এর মূল উদ্দেশ্য জানতে চায়নি। তা'রা রাগ করেছে, অভিমান করেছে, অবিশ্বাসের হাসি হেসেচে।—কিন্তু কেউই শ্রদ্ধা নিয়ে—সম্ভ্রম নিয়ে—বিশ্বাস নিয়ে একথা কখনো জিজ্ঞাসা করেনি······না বৎস, কেউ তা'রা তা করেনি!

'সাধারণ জগতের বিচারে তুমি নিতান্ত যুবক। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে কি অপূর্ব্ব জিনিষ রয়েছে। তুমি বুদ্ধিমান। হাঁ, তোমাকে আমি এখানকার সব কথা বলব।

'সাধারণ মানুষের জীবনকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। জীবনের প্রথম দিকে যা কিছু মহৎ, যা কিছু উন্নত—তার সব কিছুর পক্ষেই সে থাকে ছোট এবং অনুপযুক্ত। আর জীবনের শেষভাগে এর সব-কিছুর জন্যই সে হয়ে পড়ে অতি বৃদ্ধ, অশক্ত এবং বেমানান।

'যে জীবনটি ভগবান আমাদের দিয়েছেন, তাকে উন্নততর, মহত্তর করবার জন্য আত্মানুশীলন এবং সাধনা দরকার। কিন্তু সে সময় কৈ ? জীবনের প্রথম এবং শেষার্দ্ধের মাঝখানে সূর্য্যকরোজ্জ্বল যে ক'টি দিন পাওয়া যায়, সেই তো অবসর। কিন্তু সে আর কদিনের ? কিন্তু এখানে ?

'এখানে আমরা যৌবনকে দীর্ঘায়িত করতে পারি। হেনেল যেমন ক'রে পেরেছিলেন, চাং যেমন ক'রে পেরেছেন, তুমিও তেমনি ক'রে দেহের ক্ষয়ের পথ বন্ধ করতে পারবে। আজ তোমার দেহে যৌবনের যে লাবণ্য দেখা যাচ্ছে, একশ বছর পরেও হয়ত তোমার দেহ ঠিক এই অবস্থায়ই থাকবে। তারপরে ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্য আসবে, জরা আসবে, মৃত্যু আসবে। তা'রা আসবে, কিন্তু অতি ধীরে ধীরে। আমরা জীবনকে বিলম্বিত করতে পারি, কিন্তু মৃত্যুকে জয় করতে পারিনি,—কেউ কখনো পারবেও না। এ শুধু মহাকালের কাছ থেকে খানিকটা সময় ভিক্ষা ক'রে নেওয়া মাত্র।

'কিন্তু আমাদের এই দীর্ঘায়ু হবার চেষ্টা সংসারের ভোগসুখের জন্য নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি শান্ত হয়ে আসবে, মন পরিণত বয়সের গাম্ভীর্য্য লাভ করবে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, তিতিক্ষাই হবে তখন তোমার আশ্রয়। পাছে সময় বয়ে যায় বলে তাড়াহুড়া করতে হবে না। পৃথিবীর অশান্ত কোলাহলের আড়ালে অখণ্ড অবসর। বিক্রমজিৎ এখানে থাকতে হবে শুনে তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

বিক্রমজিৎ এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিল। হঠাৎ প্রশ্ন শুনিয়া যেন চমকাইয়া উঠিল, কহিল, 'কষ্ট?—না, আমি এখানে সুখেই আছি। আমি বিবাহ করিনি, গৃহে আমার কোন বন্ধন নেই…'

একটু পরেই আবার কহিল, 'এখানে এসে আমি শান্তি পেয়েছি বটে, তবে আপনাদের মত দীর্ঘজীবী হ'তে পারলেই যে জীবন সার্থক হবে, জোর করে এমন কথা ভাববার আমি বিশেষ কোন কারণ এখনও খুঁজে পাইনি।'

মহাস্থবির পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিক্রমজিতের দিকে তাকাইলেন। সেই দৃষ্টির সম্মুখে তাহার সমস্ত চেতনা যেন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। মহাস্থবির কহিলেন, 'দীর্ঘজীবী হতে পারলে তোমার খুসি হবার কারণ আছে। এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই সাংগ্রিলা বেঁচে আছে। শীলার যখন মরণাপন্ন হয়ে এই ঘরে রোগশয্যায় দিন

কাটাচ্ছিলেন, তখন তিনি এক দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। সংসারে সব-কিছুই ক্ষণস্থায়ী। এক শুধু ধর্ম্মই শেষ পর্য্যন্ত থাকেন। শীলার বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষ কালে কালে ধর্ম্মবুদ্ধি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তার স্বার্থবুদ্ধি তার বিবেককে অন্ধ ক'রে টেনে নিয়ে যাবে অধর্ম্ম ও অন্যায়ের পথে। শেষে তার স্বার্থপরতা, তার হিংসা, তার দম্ভ একদিন তাকেই গ্রাস করবে। তার মানবতা, তার ন্যায়পরতা এমনভাবে ক্ষুণ্ণ হবে—ক্ষীণ হয়ে যাবে যে, বল-দর্পিতের পেষণ-যন্ত্রে পীড়িত মানুষ পৃথিবীর বিচার-সভায় ধর্ম্মের দোহাই দেবে, এমন ভরসা আর থাকবে না। যুদ্ধ, মহামারী সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করবে—আমি নিজে যুদ্ধে গিয়েছিলুম, আমি জানি কি সে বীভৎসতা, কতখানি সে নিষ্ঠুরতা...'

মহাস্থবিরের মুখে নিদারুণ ক্লেশের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তিনি কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ, তুমি বিশ্বাস করো, আমি সেদিন ভবিষ্যতের যে ছবি দেখেছিলুম, তা একদিন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে। আর তার বেশী দেরীও নেই।

'তারপরে একদিন এই মহাঝড় থেমে যাবে; মুমূর্ষু পৃথিবী যখন ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে হাহাকার করবে, তখন —তখন আমাদের প্রয়োজন হবে। সেই দিনটিতে আমরা যেন বেঁচে থাকতে পারি, এই-ই হ'ল এখানকার সাধনা।

'যে মহাধ্বংস আসছে তা' আমাদেরও ছেড়ে দেবে এমন ভরসা আমরা করিনে। আমাদের একমাত্র আশা, হয়ত তা'রা অবহেলায় আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। যখন সব শেষ হয়ে আসবে, তখন আমরা আমাদের এতদিনের সঞ্চয় তাদের হাতে তুলে দেব। আমাদের সঞ্চয় ধন নয়, —ধর্ম্ম। তখন আবার জগতে শান্তি আসবে। আবার ভগবান তথাগতের শান্তির বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

বলিতে বলিতে মহাস্থবির আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটা প্রবল আবেগে তাঁহার দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। তিনি আস্তে আস্তে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। খোলা জানালা দিয়া অজস্র নীলাভ জ্যোৎস্না তাহার মুখের উপরে আসিয়া পড়িল। বিক্রমজিতের মনে হইল, মহাস্থবিরের চোখদুটি যেন অকস্মাৎ জলে ভরিয়া গিয়াছে। তিনি দূর আকাশের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

আচ্ছন্নের মত বিক্রমজিৎ যখন মহাস্থবিরের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। সুব্রত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

পরদিন বিক্রমজিতের সবই যেন কেমন স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

ভোর না হইতেই সুব্রত আসিয়া ধরিয়া পড়িল, কহিল, 'কাল কি কথা হ'ল মহাস্থবিরের সঙ্গে? লোক যোগাড়ের বিষয়ে তিনি কিছু বললেন?'

এতক্ষণে বিক্রমজিতের মনে পড়িল তাহার সমস্ত ইতিহাস। কাল মহাস্থবিরের সঙ্গে তাহার যে সব কথা হইয়াছিল, তিনি যে অদ্ভুত কাহিনী শুনাইয়াছেন, তাহার কিছু সুব্রতকে বলিতে ইচ্ছা হইল না। সুব্রতের একটা ছেলেমানুষি আছে। হয়ত সবই হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আরও একটা কথা। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে গত সন্ধ্যায় মহাস্থবির যেমন করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহাতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিক্রমজিতের মনে অবিশ্বাস স্থান পায় নাই। কিন্তু সে তো সুব্রতের কাছে ঠিকমত করিয়া জিনিষটি ধরিতে পারিবে না। তাই সে কহিল, 'লোক যোগাড়ের সম্বন্ধে মহাস্থবিরের সঙ্গে আমার কোন কথাই হয়নি।'

সুব্রত লাফাইয়া উঠিল, কহিল, 'বাঃ রে! কাল অত রাত পর্য্যন্ত আপনাদের তা'হলে কি কথা হ'ল? আমি প্রায় এগারোটা অবধি আপনার জন্য বসেছিলুম, তবু আপনি এলেন না। কাল ফিরেছিলেন কটায়?'

বিক্রমজিৎ কহিল, 'কাল এ সম্বন্ধে কোন কথা হয়নি।' ইহার বেশী সে আর কিছু বলিল না। সুব্রতের শেষের প্রশ্নটারও জবাব সে দিল না।

কিন্তু সুব্রত ইহাতেই চুপ করিয়া যাইবার ছেলে নয়। আবার কহিল, 'মহাস্থবির লোক কি রকম? শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ডোবাবেন না তো?'

কাল সন্ধ্যার স্মৃতি তখনও বিক্রমজিতের মনে জাগিয়াছিল; সেই উজ্জ্বলকান্তি ধ্যান-গম্ভীর সন্ন্যাসী! তাঁহার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কি জোর, কতখানি করুণা মিশানো ছিল! তাঁহার প্রত্যেকটি কথা এখনও বিক্রমজিতের কানে বাজিতেছিল। সে কহিল, 'তাঁকে দেখলে সম্ভ্রমে মাথা আপনা-আপনি নুয়ে আসে।'

'ফিরে যাবার বন্দোবস্ত কেন করলেন না? তিনি নিশ্চয়ই জানেন, আমরা দেশে ফিরে যাবার জন্য কি রকম ব্যাকুল হয়ে উঠেছি!'

'তাঁর সামনে বসে আর তাঁর কথা শুনে দেশে ফিরে যাবার কথা আমার মনেই হয়নি।'

এবারে সুব্রত যথার্থই বিস্মিত হইল। বিক্রমজিতের উপর একটু অভিমানও হইল। সে জানে যে সুব্রত দেশে যাইবার জন্য কি রকম অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কাল সেই সুযোগে একবার কথাটাই পাড়িল না। যদি মহাস্থবিরের সঙ্গে আবার শীঘ্র দেখা না হয়?—তবে? সুব্রতের চোখে জল আসিল। বিক্রমজিৎ পর্য্যন্ত তাহার এত ব্যাকুলতার কিছুমাত্র মূল্য দিল না! তবে সে দাঁড়াইবে কাহার কাছে?

এমন সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। অত্যন্ত লঘু-পায়ে ছোট একটি চীনা মেয়ে ঘরে ঢুকিল। বারো তেরো বছরের বেশী বয়স হইবে না। বিক্রমজিৎ এবং সুব্রত দুইজনেই অবাক হইয়া গেল। মঠে আবার মেয়েও আছে নাকি? মেয়েটি কিন্তু তাহাদের লক্ষ্যই করিল না, ঘরের কোণে একটা পিয়ানো ছিল, ডালা খুলিয়া দু'একটা গৎ বাজাইতে লাগিল। বিক্রমজিৎ নিজে সঙ্গীতজ্ঞ। বাজনা শুনিয়াই বুঝিতে পারিল, এ বাজনা কাঁচা হাতের নয়। মেয়েটি এত অল্প বয়সে এসব শিখিল কোথা হইতে? সব চাইতে বড় প্রশ্ন—মেয়েটি এখানে আসিল কি করিয়া?

বাজনা আরম্ভ হইবার পর তাহাদের কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ বাজাইবার পর মেয়েটি যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সুব্রত এতক্ষণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। বারবার সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইতেছিল। সে চলিয়া যাইতেই সুব্রতের চমক ভাঙ্গিল; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, ওকে দেখলেই মনে হয় চীনা মেয়ে। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য! ওকে এতক্ষণ দেখছিলুম আর কেবল আমার এক ছোট বোনের কথা মনে পড়ছিল। নাক-চোখের যে খুব মিল আছে তা নয়, তবে মুখের গড়নটি অবিকল তারই মত। ও কি! আপনি হাসচেন!'

'কই—না, হাসচি না তো।' তারপর একটু থামিয়া কহিল, 'তোমার তো ভালই হ'ল হে সুব্রত! এই নির্ব্বান্ধব দেশে একলাটি ছিলে, জানাশুনার মধ্যে ছিলুম কেবল আমি। তা' এখানেও তোমার একটি বোন মিলে গেল। তোমার আর এখন চিন্তা কি!'

'না না, ঠাট্টা নয়'—সুব্রত একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, 'ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রথমটায় আমি চমকে গিয়েছিলুম। দেশে ফিরবার সময় ও যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চায়, আমি তবে ওকে নিয়ে যাবো।'

সুব্রত বরাবরই একটু পাগলাটে, কিন্তু তাই বলিয়া ও যে এই রকম অদ্ভুত একটা প্রস্তাব করিতে পারে, বিক্রমজিৎ তাহা মনে করে নাই। সুব্রত কি ঠাট্টা করিতেছে? ও নিজেই দেশে ফিরিতে পারিবে কিনা, সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহার উপর আবার এই মেয়েটি! সুব্রতকে যদি বা ছাড়িয়া দেয়, মেয়েটিকে ইহারা ছাড়িয়া দিবে কেন? তাই সে পরিহাসের ছলেই কহিল, 'সে যেন বুঝলুম, কিন্তু ঘরে ফিরে গেলে তো তুমি তোমার আসল বোনকেই পাবে!'

এই কথায় সুব্রতের চক্ষু কেমন করুণ হইয়া আসিল। ম্লান মুখে কহিল, 'ওঃ! আপনাকে তার কথা বলাই হয়নি। আমার সেই বোনটি পদ্মার জলে ডুবে মারা গেছে!'

বিক্রমজিৎ ব্যথিত হইল। না জানিয়া সুব্রতের মনে আঘাত দিয়াছে। তাই একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে গেল, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই সুব্রত বাধা দিয়া কহিল, 'একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেছেন বিক্রমজিৎ বাবু! মেয়েটি এখানে এলো কি করে? মঠের লোকেরাই ধরে এনেছে না কি?'

বলা বাহুল্য এবিষয়ে বিক্রমজিৎ সুব্রতের চাইতে কিছুমাত্র বেশী জানিত না। তাই কোন সদুত্তরই সে দিতে পারিল না।

সুব্রত আসল কথা ভোলে নাই। কিন্তু এমন সময় চাং আসিয়া পড়ায় সে আর যাইবার কথা তুলিল না; বাহির হইয়া গেল। যেদিন হইতে চাংএর মুখে সে শুনিয়াছে যে, একদল যাত্রী মাস দুইএর মধ্যেই আসিয়া পড়িবে, সেইদিন হইতেই সকাল-সন্ধ্যায় সে বেড়াইতে বাহির হয়। একাকী বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়.—মনে আশা—যদি যাত্রিদল আগেই আসিয়া পড়ে। আজও তেমনি বাহির হইয়া পড়িল।

চাংএর এখন আর বিক্রমজিতের কাছে কিছুই লুকাইবার প্রয়োজন নাই। আজকাল বিক্রমজিৎ প্রশ্ন করিলেই চাং তাহার সরল এবং সম্পূর্ণ উত্তর দেন, কিছুই রাখিয়া-ঢাকিয়া বলেন না। এখন মাঝে মাঝে চাংএর সঙ্গে,

মঠের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে তাহার আলোচনা হয়। চাং বলিয়াছিলেন, তাহাকে প্রথম পাঁচ বছর যে জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত, তেমনি জীবন যাপন করিতে হইবে। বিক্রমজিৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'এ নিয়ম কেন?'

'তার কারণ, ধীরে ধীরে এখানকার জল হাওয়া সইয়ে নিতে হয়। তা'ছাড়া যে জীবন ছেড়ে এসেছেন, তার সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ভুলতেও তো সময় লাগে?'

'তা বটে। তবে আপনারা কি মনে করেন অতীতের সুখ-দুঃখ স্নেহ-ভালবাসা আত্মীয় স্বজনকে ভুলতে পাঁচ বছরের বেশী সময় লাগে না?'

এই কথায় চাং মৃদু হাসিলেন। কহিলেন, 'প্রিয়জন, প্রিয়বস্তু এদের যে একেবারে ভুলে যাবেন তা নয়। তবে পাঁচ বছরের বিচ্ছেদে শোকের বা বিরহের তীব্রতাটা আর থাকে না। তখন থাকে শুধু স্মৃতি। কিন্তু সে স্মৃতি দুঃখের নয়, সে স্মৃতি তখন আনন্দই দেয়, বিক্রমজিৎ বাবু!'

চাং একটু থামিয়া আবার কহিলেন, 'প্রথম পাঁচ বছর পরে আরম্ভ হবে দেহকে তরুণ রাখবার সাধনা। আপনার দেহ যদি ভাল ক'রে সাড়া দেয়, হয়ত আরও একশ' বছর পরেও আপনার চেহারাটি এই রকমই থাকবে।'

বিক্রমজিৎ প্রশ্ন করিল, 'এই প্রণালী আপনার দেহে কি রকম কাজ দিচ্ছে?'

'আমার ভাগ্য অত্যন্ত ভাল বলতে হবে। তাই আমি খুব অল্প বয়সে এখানে এসে পড়েছিলাম। আমি চীনাবাহিনীতে কাজ করতুম। পার্ব্বত্য পথ দিয়ে যাবার সময় আমরা দলশুদ্ধ সবাই পথ হারিয়ে ফেলি। তারপর ঘুরতে ঘুরতে আমি একাই কেমন ক'রে এখানে এসে পড়লুম। সে হ'ল ১৮৫৫ সালের কথা। আমার বয়স তখন বাইশ। আমার আসার দু'বছর পরেই হেনেল নিহত হ'ন। সে কাহিনী তো আপনি মহাস্থবিরের কাছ থেকে শুনেছেন।'

বিক্রমজিৎ মনে মনে হিসাব করিয়া কহিল, 'বাইশ! তাহ'লে এখন আপনার বয়স হ'ল সাতানব্বুই।'

চাং হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। বিক্রমজিৎ প্রশ্ন করিল, 'আপনি লামা ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েচেন?'

চাং হাসিয়া কহিলেন, 'না এখনও হইনি। মঠের লামারা যদি অনুমতি দেন, তবে একশ বছর পূরো হ'লে আমিও লামা হ'ব।'

'একশ বছর বয়স না হ'লে লামা হওয়া চলে না নাকি?'

'না, তা ঠিক নয়। মোটামুটি দেখা গেছে একশ বছর বয়স না হ'লে মনের একটা বিশিষ্ট পরিণতি হয় না। তবে এ নিয়মের এমন কিছু বাঁধাবাঁধি নেই। যারা অল্পবয়সেই জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য লাভ করেন, তা'রা একশ'র অনেক আগেই লামা হতে পারেন।'

'আচ্ছা, আরও কত কাল আপনি বাঁচবেন আশা করেন?'

চাং আবার হাসিলেন, কহিলেন, 'আশা ঠিক আমরা কিছুই করিনে। তবে এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, আরও শ'খানেক বছর বাঁচতে পারি।'

বিক্রমজিৎ ইহাদের আশ্চর্য্য পরমায়ুর কথা মহাস্থবিরের কাছেই শুনিয়াছিল, কিন্তু তবু চাংএর মুখে শুনিয়া বিস্মিত হইল। সমস্ত জিনিষটা সে ঠিক বিশ্বাসও করিতে পারিতেছে না, আবার অবিশ্বাসও অসম্ভব। যদি কখনও মনের কোণে অবিশ্বাস আসিয়া উঁকি দেয়, তখনই মহাস্থবিরের ধ্যানস্তব্ধ মুখের কথা মনে পড়িয়া যায়। অমনি সব অবিশ্বাস, সকল সন্দেহ কোথায় মিলাইয়া যায়! তাহার মনের সত্যিকারের ভাব যাহাই থাকুক, এবিষয়ে তাহার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। কি করিয়া ইহা সম্ভব! সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন যদি আপনি এই দেশ ছেড়ে বাইরের জগতে চলে যান, তাহ'লে আপনার দেহের অবস্থা কি রকম হবে?'

'এখন বাইরে গেলে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমার প্রকৃত যা বয়স, সেই পরিমাণ বার্দ্ধক্য দেখা দিবে, আর তার অর্থ হ'ল মৃত্যু। বিক্রমজিৎ বাবু, আপনি যে সম্ভাবনার কথা বললেন, কিছুকাল আগেই এই রকম

একটা ঘটনা এখানে ঘটেছিল। আমাদের মঠের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী কোন একটা বিশেষ কাজ উপলক্ষে চুংকিং গিয়েছিলেন। তখন তার বয়স হবে তিরানব্বুই। যখন এখান থেকে রওনা হলেন, তখন তার চেহারা যুবকের। চুংকিংএ বোধ হয় দিন তুইএর বেশী ছিলেন না। কিন্তু তখনই তাকে বার্দ্ধক্য এমন ভাবে আক্রমণ করেছিল যে, তিনি অতিকষ্টে এখানে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। যখন ফিরে এলেন, তাকে প্রথমে চেনাই যায়নি। অল্প কয়দিনের ব্যবধানে এমন সাংঘাতিক পরিবর্ত্তন আমি আর কখনও দেখিনি। মনে হ'ল তার চাইতে বুড়ো লোক বোধ হয় পৃথিবীতেই নেই। এখানে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন।'

বিক্রমজিৎ গল্প শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল; চাংএর শেষ কথার অনুবৃত্তি করিয়া কহিল, 'মারা গেলেন!'

হঠাৎ বিক্রমজিতের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়িল। তাহাকে সেই একদিনের পরে আর দেখা যায় নাই। তবে সে সুব্রতের কাছে শুনিয়াছিল, তাহার সঙ্গে নাকি মেয়েটির আরও তু'একবার দেখা হইয়াছে। মেয়েটির নাম লো-সেন, ইংরাজীতে চমৎকার কথা বলিতে পারে।

বিক্রমজিৎ কহিল, 'আমার কৌতূহল যদি ক্ষমা করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

চাং ঘাড় নাড়িলেন, কথা কহিলেন না।

বিক্রমজিৎ কহিল, 'লো-সেন এখানে এলো কি করে?'

'লো-সেন চীনের রাজবংশের মেয়ে। ওর বিবাহ ঠিক হয়েছিল তুর্কিস্থানের রাজকুমারের সঙ্গে। ওদের দেশী প্রথা অনুসারে কন্যাকেই পাত্রের বাড়ী যেতে হয় বিবাহের জন্য। রাজকুমারী লো-সেনও দাস-দাসী এবং অনুচরবর্গ নিয়ে তুর্কিস্থানের দিকে রওনা হয়েছিলেন। পথে তা'রা পাহাড়ে ঝড়ের কবলে পড়েন। পার্ব্বত্য দেশে একবার পথ হারালে আর তা খুঁজে পাওয়া অসাধ্য। অনেক কষ্টে শেষ পর্য্যন্ত রাজকুমারী এবং তার একজন মাত্র অনুচর এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। বাকী সবার যে কি অবস্থা হয়েছিল তা আর জানা যায়নি।'

'এ কতদিন আগের কথা?'

'লো-সেন এখানে এসেছেন ১৮৮৪ সালে। ওর বয়স তখন বারো কি তেরো।'

'তখনই বারো-তেরো!' বিক্রমজিৎ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, 'ওর বয়স এখন তা'হলে প্রায় ষাট!'

চাং বিক্রমজিতের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইলেন, 'হাঁ, ওর দেহ আশ্চর্য্য রকমে তরুণ রয়ে গেছে।'

বিক্রমজিৎ আবার প্রশ্ন করিল, 'এখানে এসে প্রথম কোন অসুবিধা বোধ করেন নি উনি?'

'প্রথমটায় কিছু অসুবিধা হয়েছিল বৈকি। বাড়ীর জন্য খুব কাঁদাকাটা করতেন। তারপর ধীরে ধীরে সয়ে যায়। তবে এখন আর বাইরে থেকে কিছু বোঝা না গেলেও, মনে হয় ভিতরে ভিতরে এখনও ওর বাড়ীর জন্য একটা টান রয়ে গেছে। প্রায়ই আনমনে কি ভাবে। আশা করা যায়, আর একটু বয়স হ'লে তাও হয়ত থাকবে না।—'বলিয়া চাং মৃদু হাসিলেন।

মহাস্থবিরের সাথে সাক্ষাতের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিক্রমজিতের সঙ্গে মঠের কয়েকজন লামার আলাপ হইয়া গেল। ইহাদের প্রত্যেকের মুখেই সংযমের একটা স্থির দীপ্তি সে লক্ষ্য করিয়াছিল। চোপিনের যে সাক্ষাৎ শিষ্যের কথা মহাস্থবির বলিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেও পরিচয় হইল। তিনি মাত্র অল্প কিছুদিন হইল লামা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাই এখনও পূর্ব্বস্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া দখিনা বাতাসের মত তাহার মনকে দোলা দিয়া যায়। দূর-বন-গন্ধবহ বাতাসে যেমন তরুলতা দুলিতে থাকে, তাহার মনও তেমনি মাঝে মাঝে দুলিয়া উঠে। তাহাতে বেদনা নাই, আছে মৃদু একটা আনন্দের আভাস। বিক্রমজিৎ তাহার কাছ হইতে গোপনে অপ্রকাশিত দুই-একটা বাজনার গৎ শিখিয়া লইল।

বিক্রমজিৎ একদিন কথায় কথায় চাংকে বলিয়াছিল, 'এখনও আপনাদের পূর্ব্বস্মৃতি বেশ্ মনে পড়ে?'

তিনি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, 'পড়ে বৈকি! যারা নতুন লামা হয়েছেন এবং আমরা এখনও মনকে একেবারে দেহের গণ্ডীর বাইরে আনতে পারিনি। কিন্তু একদিন পারব এ ভরসা রাখি। একমাত্র মহাস্থবিরই দেহকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছেন বলে মনে হয়। দিন রাত্রির অধিকাংশ সময়ই তিনি বিশ্বের মঙ্গল কামনায় ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেন।'

বিক্রমজিৎ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'ভাল কথা, মহাস্থবিরের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে বলতে পারেন?'

'আর পাঁচ বছর পরে,' চাং শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন।

কিন্তু দেখা গেল চাংএর অনুমান সত্য নহে। কারণ দু'একদিনের মধ্যেই মহাস্থবির আবার বিক্রমজিৎকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবারে মহাস্থবিরের সামনে যাইতে তাহার বুক কেমন দুরু দুরু করিয়া উঠিল। মনে হইল, কে যেন প্রবল সম্মোহন শক্তির বলে তাহাকে অনিবার্য্য বেগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

নানা কথার পর মহাস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাংগ্রিলা তোমার কেমন লাগচে?'

সাংগ্রিলা এবং ইহার শান্ত সৌন্দর্য্য সত্যসত্যই বিক্রমজিতের কাছে ভাল লাগিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে কহিল, 'আমার খুবই ভাল লাগচে।'

মহাস্থবির বাহিরের দিকে তাকাইলেন, অনেকটা আত্মগতভাবেই বলিলেন, 'বিক্রমজিৎ, তোমার বয়স অল্প। কিন্তু তোমার মুখ দেখলেই মনে হয়, সংসার সম্বন্ধে তোমার মনে একটা কেমন নির্লিপ্ত ভাব যেন রয়েছে। তুমি কি জীবনে কোন গভীর দুঃখ পেয়েচো?'

এই সহানুভূতির স্পর্শে বিক্রমজিতের মনটা একটু বিকল হইয়া গেল। সে কহিল, 'হয়ত আমার নিজের কথাটি আপনাকে ঠিকমত বোঝাতে পারব না। যারা ছোট সংসার নিয়ে ব্যস্ত আছে, তাদের মনেও প্রেম দয়া মায়া—এই সব বৃত্তিই রয়েছে। তবে এই বৃত্তিগুলির প্রকাশ অতি সামান্য এবং সাধারণ হয়েই দেখা দেয়। কিন্তু যখন একদেশের সঙ্গে আর এক দেশের যুদ্ধ বাঁধে, তখন এই সব বৃত্তিগুলিকেই বাড়িয়ে তোলা হয়। দিনরাত নানারকম প্রচারকার্য্য চলতে থাকে,—তোমার দেশ বিপদগ্রস্ত, তোমার ঘর বিধ্বস্ত হতে বসেছে, তোমার আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ বিপন্ন! মানুষের দেশ-প্রেম, মানুষের স্বাদেশিকতা, মানুষের প্রেম-প্রীতি—সব-কিছুর উপরেই চলতে থাকে প্রচারের চাবুক। বৃত্তিগুলি তা'তে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব বৃত্তি

গুণ বলে বিবেচিত হ'ত, যুদ্ধের আবহাওয়ায় তা'রা ঘুলিয়ে বিকৃত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার মূল্য মানুষকে দিতে হয়। তলে তলে তার সমস্ত মনটাই যায় অসার হ'য়ে। তার সমস্ত বোধ-শক্তিটাই যেন একেবারে লুপ্ত হয়ে পড়ে।

'তারপর যখন আবার শান্তি ফিরে আসে, তখন জীবনযাত্রার সব-কিছুই আগের মত চলতে থাকে; কিন্তু আগের জায়গায় ফিরতে পারে না শুধু মন। একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদ তাকে গ্রাস করে বসে। বস্কুলে যাবার আগে চীনের যুদ্ধে আমি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল মিশনের সঙ্গে ছিলুম। ঘোর সংসারীর মনও কেমন ক'রে যুদ্ধের আওতায় এলে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তা আমি নিজের চোখেই দেখেছি, নিজেও কিছু কিছু উপলব্ধি করেছি। তাই বোধ হয় সংসারের সব-কিছুর থেকেই আমার মনটা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যুদ্ধের বিভীষিকা আমার মনে কি যে দারুণ ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে··· 'বলিতে বলিতে বিক্রমজিৎ সত্যি সত্যিই শিহরিয়া উঠিল।

মহাস্থবির কহিলেন 'ঠিক বিক্রমজিৎ, তুমি ঠিকই বলেছো। এভাবে সংসার থেকে মানুষের মন যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখনই হয় জ্ঞানের উন্মেষ। সমস্ত প্রবৃত্তি থেকে মন গুটিয়ে আনলে তবে সত্য লাভ হয়, তার আগে নয়।'

চাং যখন শুনিলেন যে বিক্রমজিৎ মহাস্থবিরের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। প্রথম পাঁচ বছর শেষ না হইলে কেহই দ্বিতীয়বার মহাস্থবিরের দর্শন লাভ করিতে পারে না। ইহাই সাংগ্রিলার নিয়ম। যদিও তাহারা নিয়মের দাস নন এবং নিয়মানুবর্ত্তিতারও আতিশয্য পছন্দ করেন না, তাহা হইলেও এই বিশেষ নিয়মটির এতদিন পর্য্যন্ত কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। তাই চাং কহিলেন, 'আশ্চর্য্য, বিক্রমজিৎবাবু, অতি আশ্চর্য্য !'

বিক্রমজিৎ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরায় কহিলেন, 'মহাস্থবির সাধন-পথের অনেক উঁচু স্তরে রয়েছেন। সাধারণ সাংসারিক লোকের সঙ্গে বেশীক্ষণ আলাপ করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তাদের উপস্থিতিই তিনি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেন না। তাই মানুষ সাধারণতঃ ঘন ঘন তাঁর দর্শন পায় না। অথচ আপনার বেলায় দেখ্‌চি সাধারণ নিয়ম একেবারে বদলে গেছে। আপনি অসাধারণ ভাগ্যবান, আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

চাং সচরাচর কোন রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন না। তিনি যখন এই ঘটনায় এতখানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন বিক্রমজিৎ বুঝিতে পারিল মহাস্থবির তাহাকে কিরূপ সম্মান দিয়াছেন।

সুব্রতের কথা ভাবিলে বিক্রমজিতের দুঃখ হয়। সে এখনও আশায় দিন কাটাইতেছে। প্রত্যহ নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় তাহার অনুসন্ধানের কাজে বাহির হয়। অনেকখানি আশা লইয়া বাহির হয়, কিন্তু প্রত্যহই নিরাশ হইয়া ফেরে। তবু আবার পরের দিন নবীন উদ্যমে বাহির হইতে ছাড়ে না। বেচারী এখনও জানে না যে, এই তুষার-ভূমি হইতে বাহিরের জগতে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সে যখন প্রকৃত সত্য জানিতে পারিবে, তখন? বিক্রমজিৎ সুব্রতের কথা ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। একদিন সে চাংকে কহিল, 'সুব্রতের কথা ভেবে আমি সত্যি বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। ও যখন সব জানতে পারবে, তখন ওকে সামলানো দায় হবে।'

চাং সহানুভূতির সুরে কহিলেন, 'হাঁ, বিক্রমজিৎ বাবু! ওকে বাগ মানানো শক্ত হবে। তবে কি জানেন! এ সবই অত্যন্ত সাময়িক। পনেরো বিশ বছর পরে আর এ ব্যথা থাকবে না।'

এখানে সময় অত্যন্ত মন্থর, তাই চাং অবলীলাক্রমে পনেরো-বিশ বছরের কথা বলিতে পারিলেন। কিন্তু বিক্রমজিৎ সুব্রতকে ভালবাসিত। তাই তাহার ভাল-মন্দের প্রতি সে উদাসীন থাকিতে পারে না। তা'ছাড়া সে যে জগতের মানুষ, সেখানকার দৃষ্টিভঙ্গী এখানকার হইতে একেবারেই পৃথক। অতএব তাহার উদ্বেগ কিছুমাত্র কমিল না।

সে কহিল, 'মিষ্টার চাং, আমি তো ভেবেই ঠিক করতে পারছিনে—সত্যিকারের অবস্থা তাকে জানানো হবে কি ক'রে! সে আগ্রহে দিন গুণছে, কবে যাত্রিদল আসবে। তারপর যখন দেখবে যে তা'রা এলো না…'

চাং বাধা দিয়া কহিলেন, 'তা'রা তো সত্যিই আসবে, বিক্রমজিৎ বাবু!'

'বটে! আমার ধারণা হয়েছিল, যাত্রিদল আসবার কথা অনেকটা ছেলে-ভুলানো কাহিনীর মতই…'

চাং রাগ করিলেন না। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 'না বিক্রমজিৎ বাবু, আমরা তো মিছে কথা বলিনে! আমরা সত্যিই আশা করছি আর কিছুদিনের ভিতরেই যাত্রীরা সব এসে যাবে।'

'তাই যদি হয়, তবে সুব্রতকে ঠেকাবেন কী ক'রে?'

'আমরা তো কাউকে ঠেকাই নে,' চাং মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, 'তিনি নিজেই দেখতে পাবেন যে, যাত্রিদল তাকে সঙ্গে নিতে একেবারেই নারাজ।'

'ওঃ, এই ভাবেই তাহ'লে আপনারা এখান থেকে লোকের বাইরে যাওয়া বন্ধ করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এর পরে সুব্রতের অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে মনে করেন?'

চাং একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, 'সুব্রত বাবু যুবক, একবার নিরাশ হ'লেই তিনি ভেঙ্গে পড়বেন

বলে মনে হয় না। এরা নিতে না চাইলে সামনের বছরের যাত্রিদলের জন্য তিনি আবার অপেক্ষা করবেন। এই রকম দু'তিন বছর গেলে তার মন আপনিই অনেকটা শান্ত হয়ে আসবে। তখনও দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছে থাকবে, কিন্তু এতটা উতলা নিশ্চয়ই হবেন না।'

চাংএর অনুমানের কথা শুনিয়া বিক্রমজিৎ হাসিল, কহিল, 'সুব্রতকে আপনি তাহ'লে মোটেই চিনতে পারেন নি। প্রথমবার বিফল হ'লে সে একদিনও আর অপেক্ষা করবে না। চেষ্টা করবে পালিয়ে যেতে।'

চাং এবার বিস্মিত হইলেন, 'পালাবার প্রয়োজন হবে কেন? কেউ তো তাকে ধরে রাখেনি। প্রকৃতি দেবী পাহাড় দিয়ে ঘিরে যতটুকু পাহারার বন্দোবস্ত করেছেন, সে-ই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট···'

বিক্রমজিৎ চাংএর কথার জের টানিয়া কহিল,—'এবং প্রকৃতি দেবী সেই পাহারার কাজ এমন সুন্দরভাবে করছেন যে, বাইরের পাহারার আর দরকারই হয় না! তাই নয় কি মিষ্টার চাং? কিন্তু মনে করুন এ সত্ত্বেও যদি সে চলে যায়।'

'এক রাত্রি বাইরে বরফের উপর কাটালেই তিনি এখানে ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুল হবেন।' চাংএর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু এবং স্পষ্ট।

'কিন্তু যারা ফেরে না তা'রা?'

'তাদের কথা তো আপনার প্রশ্নের ভিতরেই রয়ে গেছে, বিক্রমজিৎ বাবু। তা'রা···তা'রা আর ফেরেনই না।' চাং 'আর ফেরেনই না' কথাটার উপর খুব জোর দিলেন।

বিক্রমজিৎ বুঝিল, তাহারা আর যেমন ফেরে না, গন্তব্য স্থানেও তেমনি আর তাহারা পৌঁছাইতে পারে না। পথেই সীমাহীন বরফের দেশে তাহারা মিলাইয়া যায়।

চাং আবার কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আশা করি আপনার বন্ধু বুদ্ধিমান্। তিনি কিছুতেই অতটা অবিবেচকের মত কাজ করবেন না,' বলিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

নানা রকমের আলোচনা চলিতে লাগিল। বিক্রমজিৎ হঠাৎ এক সময় কহিল, 'একটা জিনিষ লক্ষ্য করেচেন মিষ্টার চাং? সুব্রত এই অল্প ক'দিনের ভিতরই রাজকুমারী লো-সেনের সঙ্গে কি রকম ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলেচে! প্রথম যখন রাজকুমারীকে দেখি, তখন তিনি ছিলেন আশ্চর্য্য রকম শান্ত। আর এখন সুব্রতের সঙ্গে ক'দিন মিশেই যেন একেবারে বদলে গেছেন। তাব যেন আবার বারো বছর বয়স ফিরে এসেছে। সুব্রত না হয় তার বয়সের কথা কিছু জানে না, কিন্তু তিনি নিজে তো জানেন তার সত্যিকারের বয়স কি! দেখেছি, রাজকুমারী সুব্রতকে মাঝে মাঝে দাদা বলেও ডাকেন! আশ্চর্য্য!'

চাং গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাহার মুখের উপর ক্ষীণ একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। তিনি প্রায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আপনাকে আগেই এক দিন বলেছি, রাজকুমারী এখনো বাড়ীর কথা ভুলতে পারেন নি। নিজের দেহের দিকে যখন তাকান, তখন বোধ হয় ভুলে যান যে, তার বয়স এখন আর অল্প নেই। তার দেহটা অদ্ভুত রকমে তরুণ রয়ে গেছে, কিন্তু মনটা একেবারেই

পরিণত হয়নি। তাই সুব্রত বাবুর চঞ্চলতার ছোঁয়া তাকেও লেগেছে!' বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবেই বলিলেন, 'কে জানে! হয়ত মেয়েদের মনের পরিণতি পুরুষের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। হয়ত পিছিয়ে পড়ে—'

দূরে একটা বাজনার আওয়াজ শোনা গেল। বোধ হয় পাহাড়ীদের কোন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। চাং এবং

বিক্রমজিৎ জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সামনে ছোট পুকুরটায় অজস্র পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ওপারে কতকগুলি পাহাড়ী মানুষ বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। পদ্মগুলি ভোরের বাতাসে কাঁপিতেছে। দূর দিগন্তে,

কারিকলের তুষার-শৃঙ্গ তরুণ সূর্য্যের মুকুট পরিয়া ঝলমল করিতেছে। তরুলতা, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, দূরের দেবদারু গাছগুলি সবাই যেন নিতান্ত আপনার জনের মত বিক্রমজিৎকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে আনমনে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সেই রাত্রেই মহাস্থবির বিক্রমজিৎকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিক্রমজিৎ আসিয়া প্রণাম করিল। জানালায় পুরু পর্দ্দা লাগানো ছিল। হঠাৎ তাহার ফাঁক দিয়া বিদ্যুতের চমক দেখা গেল। বাহিরে ঝড় আরম্ভ হইয়াছে।

মহাস্থবির আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, 'সুব্রতের খবর কি? সে কি এখনও তেমনি উতলাই আছে?'

'হাঁ, বরং যতই দিন যাচ্ছে, ততই সে আরো বেশী অস্থির হচ্ছে। তাকে নিয়ে একটা সমস্যা দাঁড়াবে।'

মহাস্থবিরের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি শান্তকণ্ঠে কহিলেন, 'কিন্তু সে সমস্যার সমাধান তো করতে হবে তোমাকে!'

'আমাকে?' বিক্রমজিৎ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'আমাকে করতে হবে কেন?'

মহাস্থবির স্থির কণ্ঠে কহিলেন, 'এবারে আমার যাবার সময় হয়েছে।'

কথাটা শুনিয়া বিক্রমজিৎ চমকাইয়া উঠিল। কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, সে কিছুতেই যেন পূরাপূরি উহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

মহাস্থবির তাহার বিস্ময় এবং চমক দেখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ, তুমি বিস্মিত হচ্ছো! কিন্তু আমরা তো কেউ অমর নই। আমার ভালমন্দ যত কিছু সবই আজ ভগবান বুদ্ধের চরণে অর্পণ করেছি। যদি আমার যাবার দিন সত্যি এসে থাকে, তাতে তো কারো দুঃখ করবার কিছু নেই।

'আজ ওপারের খেয়ায় পা যখন দিয়েছি, তখন ক্ষীণ একটি বাসনা মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌চে। যাবার লগ্নে ওপারের শেষ ডাকটি যখন এলো, তখন এপারের সব দেনা-পাওনাই মিটিয়ে দিয়ে যেতে চাই।'

বিক্রমজিৎ চুপ করিয়া রহিল, মহাস্থবির আবার কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ, আমার শেষ ইচ্ছাটি তোমাকেই কেন্দ্র ক'রে।'

'আমাকে কেন্দ্র ক'রে? আপনি আমাকে অসাধারণ সম্মান দেখাচ্ছেন।'

মহাস্থবির তখন তখনই উত্তর দিলেন না। বাহিরে বিদ্যুতের চমকানি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা অশান্ত দৈত্য যেন ভীষণ দাপাদাপি করিতে লাগিল।

একটু পরে তিনি কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, আমি তোমাকে খুব ঘনঘন সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ করেছি। সেটা এখানকার স্বাভাবিক নিয়ম নয়। কিন্তু নিয়ম আমাদের দাস, আমরা নিয়মের দাস নই। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি আমাকে বিস্মিত করেছে···' বলিয়া হঠাৎ তিনি হাত বাড়াইয়া বিক্রমজিতের হাত তুখানি ধরিলেন; কহিলেন, 'বিক্রমজিৎ, আমি তোমার হাতে সাংগ্রিলার ভার দিয়ে যেতে চাই। এইটি আমার শেষ ইচ্ছা।'

ঘরের মধ্যে বাজ পড়িলেও বিক্রমজিৎ বোধ হয় এতটা বিস্মিত হইত না। এ তো অনুরোধ নয়, এ যেন কঠোর আদেশ। তবু এ আদেশের মধ্যে বিপুল স্নেহ এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বাহিরে মত্ত প্রভঞ্জন তীব্রবেগে দরজা-জানালায় মাথা ঠুকিতে লাগিল। মাটির প্রদীপটি বারবার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুতের আলো জানালার ফাঁক দিয়া মহাস্থবিরের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। বিক্রমজিৎ দেখিল সে মুখ কি শান্ত—কি করুণ! তিনি কহিলেন, 'আমি তোমার জন্য কতদিন ধরে অপেক্ষা ক'রে আছি। কত লোক এলো, কত লোক গেল; কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়েছিল, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তুমি আর এলে না। কিন্তু আজ তুমি এসেছো, এখন আমার ছুটি···

'বাইরে আজ ঝড় উঠেচে। সমগ্র বিশ্বে একদিন এই রকম প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠ্‌বে। স্বার্থান্ধ অত্যাচারীর নিষ্ঠুরতার কবল থেকে কারুরই নিস্তার থাকবে না। ধর্ম্ম, দয়া, মায়া—কোন কিছুর দোহাই খাটবে না। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যা কিছু ভাল জিনিষ গড়ে তুলেছে, তার সব-কিছুই এই ধ্বংস-যজ্ঞে ভস্ম হয়ে যাবে। এ আমার বহু দিনের আশঙ্কা, আর সে ধ্বংস-যজ্ঞ সুরু হবার বিলম্বও বেশি নেই। শীগ্‌গীরই দেখতে পাবে অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িতের ক্রন্দনধ্বনিতে সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেউ যে তাকে দয়া করবে, এমন ভরসা আমি করি নে। তবে হয়ত অবজ্ঞায়, অবহেলায়, তা'রা একে লক্ষ্য করবে না।

'তারপর একদিন যখন এই ঝড় থেমে যাবে, ভীষণ দুর্য্যোগের পরে শান্তি পৃথিবীতে ফিরে আসবে, তখনই সুরু হবে তোমার কাজ। জ্ঞান ও ধর্ম্ম অনুশীলনের পূর্ণ শক্তি নিয়ে তুমি সেদিন সবার সামনে এসে দাঁড়াবে। তোমার চিন্তার, তোমার ধ্যানের সম্পদ তুমি বিশ্বের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখবে। কত নতুন লোক আসবে, তুমি তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার তাদের হাতে তুলে দেবে। শেষে জীবনের সায়াহ্নে কাজ ফুরিয়ে গেলে আমারই মত তুমিও একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।

'কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, সেই ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন এক উজ্জ্বল পৃথিবী গড়ে উঠ্‌বে। সেদিন স্বার্থান্ধ মানুষের হানাহানিতে জগতের হাওয়া আর কলুষিত হবে না। হিংসা দ্বেষ বা শারীরিক বলের আতিশয্য পৃথিবীকে আর রক্তরঞ্জিত করবে না। সেদিন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই একটা গভীর মাঙ্গলিক সুর বেজে উঠবে...'

মহাস্থবির অকস্মাৎ চুপ করিলেন। বিক্রমজিৎ অভিভূতের মত তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। নিকটে কোথায় একটা বাজ পড়িল। ঘরের সার্সিগুলি ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। বিক্রমজিৎ দেখিল, মহাস্থবিরের দেহ স্থির—নিঃস্পন্দ। তাঁহার চক্ষু দুইটি মুদিত। একটা অপার্থিব দীপ্তিতে তাঁহার সমস্ত মুখ হঠাৎ অত্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সেই আলো নিভিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা উজ্জ্বল সত্য বিক্রমজিতের মনে ভাসিয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল,—মহাস্থবির যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছেন !...

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় দীপটি নিভিয়া গেল। বিক্রমজিৎ সেই অন্ধকার কক্ষে স্তব্ধ বিস্ময়ে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরের ঝড় তখন প্রলয় সূচনা করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে সে যখন আবিষ্টের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে। ছিন্নভিন্ন

মেঘের মধ্য দিয়া নীল চাঁদ দেখা যাইতেছে। অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশে তাহার সমস্ত মন যেন হঠাৎ বিকল হইয়া গিয়াছে। নিরালায় বসিয়া কিছুক্ষণ ভাবা দরকার। কি করিবে, কাহাকে খবর দিবে, সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে আসিয়া ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিল।

কোথা হইতে কি হইয়া গেল। কোথায় সে ছিল অখ্যাত বস্কুলের একজন রাজকর্ম্মচারী, আর এখন সে হইয়া বসিল সাংগ্রিলার অধ্যক্ষ! মহাস্থবিরের মৃত্যু তাহার মনটাকে আশ্চর্য্য রকম নাড়া দিয়াছিল। সে মহাভারতে ভীষ্মের ইচ্ছা-মৃত্যুর কথা পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহা তাহার চাইতে কম রোমাঞ্চকর নয়। মহাস্থবিরের শেষ কথাগুলি ঝম্‌ঝম্ করিয়া তখন পর্য্যন্ত তাহার কানে বাজিতেছিল। মনে পড়িল, মহাস্থবিরের শেষ ইচ্ছাটির কথা। তিনি যখন তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে তো প্রতিবাদ করে নাই। সেই সম্মোহন শক্তির সামনে তাহার প্রতিবাদ করিবার শক্তিও তো ছিল না! সে নতমস্তকে সেই মহাপুরুষের আদেশ মানিয়া লইয়াছিল। এখন আর পিছাইয়া পড়িলে চলিবে না।

মহাস্থবির নাই একথা সে যেন এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অথচ তাহার চোখের সামনেই কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল!

এমনই আকাশ-পাতাল কত কিছু সে ভাবিতেছিল। এমন সময় একটা শব্দ শুনিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখে সুব্রত। দারুণ উত্তেজনায় সে কাঁপিতেছে। সে কাছে আসিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, যাত্রিদল এসে গেছে। জানেন এখানকার লোকগুলো কি শয়তান! তা'রা আমাকে খবর পর্য্যন্ত দেয়নি। যাত্রীরা মঠ পর্য্যন্ত আসে না। দক্ষিণ দিকের একটা গিরিপথ পর্য্যন্ত আসে, আর সেখান থেকেই ফিরে যায়। আমি রোজ ওদের খোঁজে বেরুই, তাই তো জানতে পারলুম। কিন্তু এদের শয়তানী বুদ্ধিটা একবার দেখেচেন?'

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া সুব্রত হাঁপাইতে লাগিল। বিক্রমজিৎ কোন উত্তর দিল না। যেমন বসিয়াছিল, তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুব্রত উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু কোনই জবাব আসিল না দেখিয়া, অবাক্ হইয়া বিক্রমজিতের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার মুখে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অস্বচ্ছ আলোতেও তাহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ এবং ম্লান দেখাইতেছিল। সুব্রত আসিয়া তাহার হাত ধরিল, কহিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আপনি কি অসুস্থ?'

বিক্রমজিৎ ক্লান্ত সুরে কহিল, 'না, অসুস্থ নই—তবে বেশ একটু ক্লান্ত'

'বোধ হয় অনেকক্ষণ পড়াশুনা করেছেন আজ! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি কতক্ষণ থেকে আপনাকে চারদিকে খুঁজচি!'

'মহাস্থবিরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম।' বিক্রমজিৎ শান্তভাবে বলিল।

'ভালই হয়েছে। আজই আপনার মহাস্থবিরের সঙ্গে শেষ দেখা!' সুব্রত যেন খুব উৎফুল্ল।

সুব্রত ভাবিয়াছিল, আজই যখন তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে, তখন মহাস্থবিরের সঙ্গে বিক্রমজিতের আর দেখা হইবে কি করিয়া? কিন্তু যাহার উদ্দেশে বলা হইল, কথাটা তীরের মত গিয়া তাহাকে বিঁধিল। অতীত কয়েক ঘণ্টার ছবি সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখের সামনে উজ্জ্বল রূপে ভাসিয়া উঠিল। সে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'হাঁ সুব্রত, মহাস্থবিরের সঙ্গে আজই আমার শেষ দেখা!...' বলিতে বলিতে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

সুব্রত চমকাইয়া উঠিল, কহিল, 'কি হ'ল আপনার বিক্রমজিৎ বাবু?'

বিক্রমজিৎ সোজা হইয়া বসিল। কণ্ঠের দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কহিল, 'না, কিছুই হয়নি। হাঁ, যাত্রীদের কথা কি বলছিলে তুমি?'

সুব্রত আবার আগাগোড়া সকল কথা পুনরাবৃত্তি করিল। বিক্রমজিৎ শেষে প্রশ্ন করিল, 'তুমি কি ওদের সঙ্গে যাবে নাকি ভাবচ?'

'ভাবচি মানে?' সুব্রত লাফাইয়া উঠিল, 'নিশ্চয় চ'লে যাবো—এক্ষুণি।'

বিক্রমজিৎ আবার ভাবনায় ডুবিয়া গেল। একটু পরে দ্বিধার সহিত কহিল, 'কিন্তু যাবো বললেই তো আর যাওয়া হয় না। তার জন্য যোগাড়-যন্ত্র করা চাই। তা'ছাড়া আরও অনেক রকম বাধা আছে। মনে কর, তুমি তাদের কাছে গেলে, তা'রা যদি তোমাকে সঙ্গে নিতে রাজি না হয়? কিসের লোভেই বা তা'রা রাজি হবে বলতে পারো?'

সুব্রত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রায় চীৎকার করিয়া কহিল, 'বেশ লোক আপনি যা'হোক! সে সব বন্দোবস্ত না ক'রেই কি আমি এসেছি নাকি? তা'রা রাজি হয়েচে। তাদের আগাম টাকাও দেওয়া হয়ে গেছে। আর এই হ'ল গরম পোষাক, আপনার আর আমার'…বলিয়া সে দুই জোড়া ভারী বুট, কতগুলি ভালুকের চামড়ার জামা প্রভৃতি কাঁধ হইতে নামাইয়া নীচে রাখিল।

'কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনে'—বিক্রমজিৎ দ্বিধাগ্রস্তভাবে কহিল।

'কিচ্ছু বুঝতে হবে না আপনার। আপনি দয়া ক'রে শুধু আমার সঙ্গে আসুন।'

'কিন্তু এসব বন্দোবস্ত করলে কে? টাকাই বা পেলে কোথায়?'

'আপনাকে নিয়ে আর পারিনে। লো-সেন এই সব বন্দোবস্ত করেছে। সে যাত্রিদলের সঙ্গে অপেক্ষা করছে।'

'অপেক্ষা করছে! কেন?'

'সেও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে কি না!'

লো-সেনের নাম শুনিয়া বিক্রমজিতের স্বপ্নের ঘোর একেবারে কাটিয়া গেল। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, 'অসম্ভব!'

সুব্রতও সমান সুরে উত্তর দিল, 'অসম্ভব কিসে?'

'লো-সেন নিজে রাজি হয়েচে?'

'তবে এতক্ষণ আপনাকে বললুম কি! সেই তো সমস্ত বন্দোবস্ত করেছে।'

বিক্রমজিৎ হঠাৎ প্রায় হিংস্রভাবে প্রশ্ন করিল, 'তুমি জানো লো-সেনের বয়স কত?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'দরকার আছে বলেই বলছি। তুমি জানো তার বয়স এখন কত?'

'জানিনে, জানতেও চাইনে। আপনি কত বলেন,—সত্তর, আশি?' সুব্রত শ্লেষের সঙ্গে বলিল।

'ঠিক তাই। তার বয়স এখন প্রায় সত্তর। সে কথা সে কিছু বলেনি তোমায় ?'

সুব্রত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওর বয়স বারো তেরোর বেশী নয়। আর আপনি বলছেন সত্তর !' সুব্রত আবার হাসিয়া উঠিল।

সুব্রত আবার মিনতি করিয়া বলিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, দেরী হয়ে যাচ্ছে, উঠুন।'

একটু একটু করিয়া আবার বিক্রমজিতের মনের মধ্যে মঠের মোহ জাগিতে লাগিল। সে কহিল, 'কিন্তু আমাদের পরিচিত জগতে তো আমি ফিরে যেতে চাইনে। সেখানকার বিলাসব্যসন, মিথ্যা জাঁকজমক, ছলচাতুরী......না সুব্রত, সেখানে আমি আর ফিরে যাবো না।'

সুব্রত আবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, অনুনয় করিল, রাগ করিল, কিছুতেই ফল হইল না। বিক্রমজিতের কানের কাছে মৃদুকণ্ঠে তখন বাজিতে লাগিল,—'সাংগ্রিলার সব ভার আমি তোমার উপর দিয়ে যেতে চাই—এইটিই আমার শেষ ইচ্ছা।'

সুব্রত শেষে হতাশ হইয়া কহিল, 'আপনি তা'হলে কিছুতেই যাবেন না ?'

'না।'

'আমি একাই তা'হলে চলি ?'

'আচ্ছা এসো ভাই, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

সুব্রত চলিয়া গেল।

জলের উপর চাঁদের ছায়া পড়িয়াছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি কাঁপিতে কাঁপিতে চাঁদের ছায়ার সঙ্গে খেলা করিতে লাগিল। বিক্রমজিৎ পাষাণমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ একভাবে বসিয়াছিল বিক্রমজিতের তাহা খেয়াল নাই। ঘণ্টাখানেক পরে সুব্রত ফিরিয়া আসিল। বিক্রমজিৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কি! ফিরে এলে যে ?'

সুব্রতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে শুষ্ককণ্ঠে কহিল, 'পারলুম না, বিক্রমজিৎ বাবু! ভয় পেয়ে ফিরে এলুম। গিরিপথ পার হওয়া আমার একার সাধ্য নয়।'

বিক্রমজিৎ প্রশ্ন করিল 'তবে ?'

হঠাৎ সুব্রত বিক্রমজিতের হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'বিক্রমজিৎ বাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচান। আপনি সাহায্য না করলে আমি ও পথ কিছুতেই একলা পার হতে পারবো না।'

বিক্রমজিৎ তবু বসিয়া রহিল। সুব্রতের চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল ; সে বিকৃতস্বরে কহিল, 'আপনার কি দয়ামায়া নেই ? মানুষের প্রাণের কি কিছু মূল্য নেই আপনার কাছে ?'

সুব্রত আর বলিতে পারিল না। চাঁদের আলোয় তাহার চোখের জল চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল। বিক্রমজিতের মনের মধ্যে প্রবল আন্দোলন সুরু হইল। একজনের চোখের জলও যদি সে মুছাইতে না পারে, তবে সমস্ত পৃথিবীকে শান্তি দিবে কোথা হইতে? তাহার সমস্ত মনটা যেন কেমন কাঁপিয়া উঠিল। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সুব্রতের মুখের দিকে তাকাইল। চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। দূরের দেবদারু গাছগুলি অন্ধকারে সারি সারি প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। একটা আবছা অন্ধকারে সমস্ত সাংগ্রিলা ধীরে ধীরে ঢাকা পড়িতেছে।

হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিক্রমজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, 'চল যাই…'

পরিশিষ্ট

বহুদিন পরে আবার জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হইল ব্রহ্মদেশে। দিল্লী হইতে অল্প কিছু দিনের মধ্যে সে আবার পূর্ব্ব-এশিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। আমি ইউনিভার্সিটির কাজ উপলক্ষে রেঙ্গুনে গিয়াছিলাম। সেইখানেই দেখা।

জয়ন্ত আবার তাহার ভ্রমণের গল্প করিল। তারপর কহিল, আমার সেই খাতাখানা পড়েছিস্?

কহিলাম, হাঁ, সেইদিন রাত্রেই পড়ে ফেলেছিলুম।

তোর কি মনে হয়?

ভারী অদ্ভুত মনে হয় সবটা। ঠিক বিশ্বাস করতেও সাহস হয় না, আবার অবিশ্বাসও করা চলে না। এ যেন সম্পূর্ণ আলাদা এক জগতের ব্যাপার। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে।

জয়ন্ত সিগারেট ধরাইয়া কহিল, আমারও তাই মনে হয়—এ অন্য জগতের জিনিষ। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিল, ভাল কথা, আমি ওর খোঁজ করবার চেষ্টা করেছিলুম। এত বড় দেশে একজন মানুষকে খুঁজে বার করা অসম্ভব, তবু আমি চেষ্টা করেছি। দিল্লী থেকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের অনুমতি নিয়ে নেপালের ভিতর

দিয়ে একবার তিব্বতেও যাবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সে পথে বেশীদূর এগুনো গেল না। তারপর একবার বার্ম্মার ভিতর দিয়েও চেষ্টা করেছিলুম, তাতেও বিশেষ কিছু সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারিনি।

পথে একজন আমেরিকান টুরিষ্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি নাকি তিব্বতের ভিতরে অনেকটা দূর পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। তাকে সাংগ্রিলার কথা বলতে খানিকক্ষণ ভেবে বললেন,—দেখুন, আমি প্রায় বিশ বছর এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা কর্চ্ছি, কিন্তু এরকম কোন মঠের নাম শুনিনি। তবে হ্যাঁ,—প্রায় বছর পনেরো আগে আমি একবার খাস তিব্বতের একটা গ্রামে গিয়ে পড়েছিলুম। সেখানকার অধিবাসীদের তু'একজন কথায় কথায় একটা মঠের কথা বলেছিল বটে, সেখানকার সন্ন্যাসীরা নাকি অনেকদিন বাঁচে। কিন্তু সেটা যে কোথায় তা তা'রা বলতে পারলো না। যতটা মনে হচ্ছে, সে মঠের নাম তা'রা সাংগ্রিলা বলেনি। অন্য কি একটা যেন বলেছিল।

জয়ন্ত আবার বলিল, এদিকে কিছু হ'ল না দেখে গেলুম আবার সেই লু-চাউতেই, যদি সেখান থেকে কোন খবর মিলে। আমেরিকান মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলুম, বিক্রমজিৎকে কি রকম ভাবে হাসপাতালে আনা হয় তার কোন বিশদ বিবরণ তিনি জানেন কি না। তিনি বললেন যে,

যিনি নিজে ঐ রোগীটিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করেননি, করেছিলেন হাসপাতালের ডাক্তার। সেই ডাক্তারটি আবার কয়েক দিন হলো চলে গেছেন হ্যাঙ্কোতে। গেলুম সেই হ্যাঙ্কোতে। ডাক্তারটিকে খুঁজে বার করতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না। বিক্রমজিতের কথা তা'কে জিজ্ঞাসা করলুম। দেখলুম কেস্‌টি তা'র ভাল ক'রেই মনে আছে।

কি ক'রে সে হাসপাতালে এলো সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বিশেষ কিছু বলতে পারলেন, না। বললেন কতগুলি চীনা কুলি তাকে তুলে নিয়ে এসেছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না!

ডাক্তার একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, হাঁ, হাঁ, আমার মনে পড়েছে—সঙ্গে একজন ছিল বটে। এক বুড়ী—একবারে থুরথুরে বুড়ী। তা'র যে কি হয়েচে তাও জানিনে।

আমি প্রশ্ন করলুম, আর কোন পুরুষ মানুষ সঙ্গে ছিল কি না—কোন বাঙ্গালী?

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, বললেন, না, আর কেউ ছিল বলে তো মনে পড়ছে না।

আর একটি প্রশ্ন ডাক্তার, সঙ্গের সেই স্ত্রীলোকটি কোন্ দেশের বলতে পারেন?

ডাক্তার আমার দিকে একবার তাকিয়ে শেষে বললেন, চাইনীজ্, মশাই, চাইনীজ!

জয়ন্ত এবং আমি বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর আবার বিক্রমজিতের কথা উঠিল। আমার মনশ্চক্ষুতে সাংগ্রিলার একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল। চারিদিকে

যোজনের পর যোজন বিস্তৃত বরফের রাশি ধূ ধূ করিতেছে। দূরে কারিকলের তুষার-শৃঙ্গ সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—পাশেই সাংগ্রিলার বৌদ্ধ-বিহার।

কল্পনার চোখে আরও একটি ছবি ফুটিয়া উঠিল। সীমাহীন বরফের মধ্য দিয়া একজন যাত্রী অতি কষ্টে অগ্রসর হইতেছে। ক্লান্ত পথিকের দেহ অবসাদে ভারী হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার চলার বিরাম নাই। এ ছবি বিক্রমজিতের। আমি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জয়ন্ত, তোর কি মনে হয়, বিক্রমজিৎ আবার সাংগ্রিলাতে পৌঁছতে পারবে?'

জয়ন্ত কোন উত্তর দিল না।

ঘরের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়ার-কুণ্ডলী ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

—শেষ—